BDeBooks.com

Read Online
pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

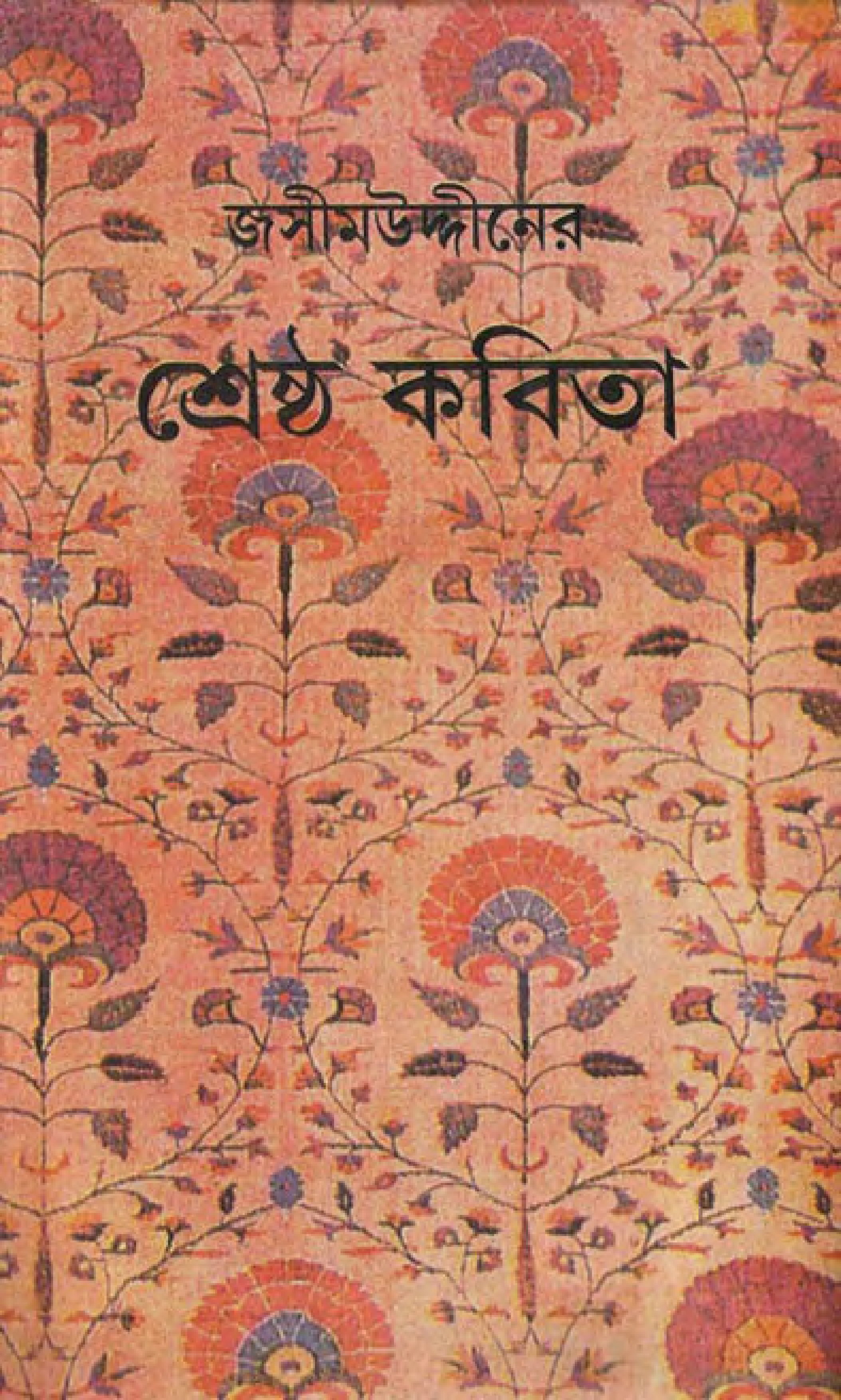

জসীমউদ্দীনের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

জসীমউদ্দীনের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

জসীমউদ্দীনের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭৩

JASHIMUDDINER SRESTHA KABITA
Best Poems of Jashimuddin
Published by SUDHANGSHU SEKHAR DEY
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 60/-

প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

দাম : ষাট টাকা

ISBN : 81-7612-727-2

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস্
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

জসীমউদ্দীনের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

সূচি

রাখালী

রাখালী ৭
    এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে
রাখাল ছেলে ১০
    রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে!
কবর ১২
    এইখানে তোর দাদির কবর
শাকতুলুনী ১৬
    ও কার বউ এল আজ
কৃষাণ-দুলালী ১৬
    কলমিলতা শাড়ি মেয়ের
বোশেখ শেষের মাঠ ১৭
    বোশেখ শেষে বালুচরের

নক্সী-কাঁথার মাঠ ১৯
    এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে

বালুচর

উড়ানীর চর ৩৮
    উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
কাল সে আসিবে ৪০
    কালকে সে নাকি আসিবে
কাল সে আসিয়াছিল ৪১
    কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে
দুরাশা ৪৭
    শূন্য নদীর কূলে

আর একদিন আসিও বন্ধু ৪৭
আর একদিন আসিও বন্ধু

ধান খেত

কৃষাণী দুই মেয়ে ৫০
কৃষাণী দুই মেয়ে
রাখালের রাজগী ৫১
রাখালের রাজা! আমাদের ফেলি
যাব আমি তোমার দেশে ৫৪
পল্লী-দুলাল, যাব আমি
চৌধুরীদের রথ ৫৬
চৌধুরীদের রথ

রঙিলা নায়ের মাঝি ৫৯
উজান গাঙের নাইয়া!

সোজন বাদিয়ার ঘাট ৬৪
আররে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই

হাসু

আমার বাড়ি ৯৮
আমার বাড়ি যাইও ভোমর
পালের নাও ৯৯
পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও
বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায় ১০০
রাত দুপুরে মেঘে মেঘে
পলাতকা ১০১
হাসু বলে একটি খুকু

রূপবতী

গৌরী গিরির মেয়ে ১০২
হিমালয় হতে আসিলে নামিয়া
অনুরোধ ১০৬
তুমি কি আমার গানের সুরের

পদ্মাপার

পদ্মাপার ১০
ও বাবু সেলাম বারে বার
কে যাসরে রঙিলা মাঝি ১০
কে যাসরে রঙিলা মাঝি
সোনার বরণী কন্যা ১০
সোনার বরণী কন্যা সাজে নানা রঙ্গে

এক পয়সার বাঁশী

খোসমানী ১১
তেপান্তরের মাঠে রে ভাই
আসমানী ১১
আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও
পূর্ণিমা ১১
পূর্ণিমাদের আবাস ছিল

মাটির কান্না

দেশ ১১
খেতের পরে খেত চলেছে
জলের কন্যা ১১
জলের উপরে চলেছে জলের মেয়ে
এ লেডি উইথ এ ল্যাম্প ১১
গভীর রাতের কালে
রজনী-গন্ধার বিদায় ১১
শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদ
বাস্তুত্যাগী ১১
দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা
কমলা রানীর দীঘি ১২
কমলা রানীর দীঘি ছিল এইখানে

সকিনা

সকিনা ১২
দুখের সায়রে সাঁতারিয়া আজ

সুখের বাসর ১২৪
নদী জমিদার অনিলক্ষীন
কৈশোর যৌবন দুহু মেলি গেল ১২৭
এখনো গন্ধ বর্ণ কোরকে
হলুদ বাঁটিছে মেয়ে ১২৯
হলুদ বাঁটিছে হলুদবরনী মেয়ে

জলের লেখন

অনুরোধ ১৩০
ছিপছিপে তার পাতলা গঠন
কবিতা ১৩১
তাহারে কহিনু
হেলেনা ১৩২
নতুন লাতিনী, সুচারুহাসিনী

ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে

বঙ্গ-বন্ধু ১৩৩
মুজিবর রহমান।
ধামরাই রথ ১৩৫
ধামরাই রথ, কোন অতীতের

রাখালী

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রানতে বসতে, জল আনতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান্ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোনোমতেই থামতে নারে।

এই মেয়েটি এমনি ছিল যাহার সাথেই হতো দেখা,
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, 'বড়ুরে তুই, মিছেমিছি হাসিস বড়ো...'
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়।
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার না সে আবির,
না সে করুণ সাঁজের গাঙে আধ-আলো রঙিন রবির।
কেমন যেন গাল দুখানি, মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে-ফোটা কলমি ফুলে কতকটা তার খেলে বাহার।

গালটি তাহার এমন পাতল, ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে,
দু-একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখছে ধরে।
সাঁঝসকালে এ-ঘর ও-ঘর ফিরত যখন হেসে-খেলে,
মনে হতো ঢেউয়ের জলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে!
এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চলতে ধীরে,
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসটিরে।
দোষ কি তাহার? ওই মেয়েটি মিছেমিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল! —অমন রূপে কেমনে রাখে পরানটা সে?
এ পথ দিয়ে চলতে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভরে।
মাঠের ছেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রানছে যেথায়
নীড়ের ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি,
ভর-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ি।

ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশিটিরে,
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় যে ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে কুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সুখের মুখর কথা।
এমনি করে দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া,
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।
সাঁজের বেলা ওই মেয়েটি চলত যখন গাঙের ঘাটে,
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগত ভারি ওদের বাটে।
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস,
ওই মেয়েটির জল-ভরনে ভাসত ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বলত যেন মনে মনে,
'জল ভর লো সোনার মেয়ে, হবে আমার বিয়ের কনে?
কলমি ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশি বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা।
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের,
সোনালতায় গড়ব বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটিরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব সরষে ফুলের পাপড়ি আনি,
কাজলতলার হাটে গিয়ে আনব কিনে পাটের শাড়ি,
ওগো বালা! গাঁয়ের বালা! যাবে তুমি আমার বাড়ি?'

এই রূপেতে কত কথাই আসত তাহার ছোট্ট মনে,
ওই মেয়েটি কলসি ভরে ফিরত ঘরে ততক্ষণে।
রূপের ভার আর বইতে নারে, কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে
কোনোরূপে চলছে ধীরে মাটির ঘড়া জড়িয়ে ধরে।
রাখাল ভাবে, কলসখানি না থাকলে তার সরু কাঁখে,
রূপের ভারেই হয়ত বালা পড়ত ভেঙে পথের বাঁকে।
গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে,
কলস ঘিরি উঠছে দুলি গেঁয়ো বালার রূপের টানে।

মনে মনে রাখাল ভাবে, 'গাঁয়ের মেয়ে! সোনার মেয়ে।
তোমার কালো কেশের মতো রাতের আঁধার এল ছেয়ে।

তুমি যদি বল আমায়, এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি
কলাপাতার আঁধার-ঘেরা ওই যে ছোটো তোমার বাড়ি।
রাঙা দুখান পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে,
পথের কাঁটা কত কিছু ফুটিতে পারে কোনোমতে।
এই যে বাতাস—উতল বাতাস, উড়িয়ে নিলে বুকের বসন,
কতখন আর রূপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন!
যদি তোমার পায়ের খাড়ু যায়বা খুলে পথের মাঝে,
অমন রূপের মোহন মোহে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে!
আহা! আহা! সোনার মেয়ে। একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।'
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হতো রাঙা,
কখন হলুদ আধ-হলুদ আব-আবির মেঘে ভাঙা।
তার পরেতে আসত আঁধার ধানের ক্ষেতে, বনের বুকে,
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফিরত রাখাল ঘরের মুখে।

সেদিন রাখাল শুনল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে,
আসবে কালি 'নওসা' তাহার ফুল-পাগড়ি মাথায় দিয়ে।
আজকে তাহার 'হলদি কোটা', বিয়ের গানে ভরা বাড়ি,
মেয়ে-গলার করুণ গানে কে দেয় তাহার পরান ফাড়ি।
সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি করছিল স্নান,
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা খান!
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুক ভেঙে যায়,
'আহা! আহা! সোনার মেয়ে! কেমন করে ভুললে আমায়!'

সারা বাড়ি খুশির তুফান—কেউ ভাবে না তাহার লাগি,
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মোকদ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এল আপন ঘরে,
সারাটা রাত মরল ঝুরে কি ব্যথা সে বক্ষে ধরে।

বিয়ের কনে চলছে আজি শ্বশুর-বাড়ি পালকি চড়ে,
চলছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধরে।
সারাটা দিন বিয়ে বাড়ির ছিল যত কল-কোলাহল,

গাঁয়ের পথে মূর্তি ধরে তারাই যেন চলছে সকল।
কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়ালে আজ কেমন কেমন,
ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছে কি ভাই তেমন তেমন?
মেয়ে-জামাই মিলছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা,
সূর্য যেন বইছে পাটে ফাগ ছড়ানো সাঁঝের বেলা।
এমনি করে কত কথাই কত জনের মনে আসে,
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে।
হায়রে আজি এই আনন্দ যারে লয়ে এই যে হাসি,
দেখল না কেউ সেই মেয়েটির চোখদুটি যায় ব্যথায় ভাসি।
খুঁজল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি,
বিজন রাতের প্রহর থাকে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি।
সেই মেয়েটির চলা-পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে,
একলা রাখাল বাজায় বাঁশি ব্যথায় ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটির সুরে বাঁশি তাহার ফেরে উদাস,
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস ;
করুণ করুণ—অতি করুণ বুকখানি তার উথল করে,
ফেরে বাঁশির সুরটি ধরে ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

‘কোথায় জাগো বিরহিণী ত্যাজি বিরল কুটিরখানি,
বাঁশির ভরে এসো এসো ব্যথায় ব্যথায় পরান হানি।
শোনো শোনো দশা আমার গহন রাতের গলা ধরি,
তোমার তরে ও নিদয়া একা একা কেঁদে মরি।
এই যে জমাট রাতের আঁধার আমার বাঁশি কাটি তারে,
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কেঁদে মরে বারে বারে।’
ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে,
আঁধার দিয়ে জড়ায় তারে, হাওয়ায় দোলায় ব্যথার ভারে।

রাখাল ছেলে

‘রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?’

'ওই যে দেখো নীল-নোয়ানো সবুজ-ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা;
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ আকাশে ছড়িয়ে পড়া আবির রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না?'

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! আবার কোথা ধাও
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।'

'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে ডেকে, গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!
সারা মাঠের ডাক এসেছে খেলতে হবে ভাই।
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই।'

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! সারাটা দিন খেলা,
এ যে বড়ো বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।'

'কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের খেতের সবুজ রঙের চেলি।
সরষে বালা নুইয়ে গলা হলদে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে।
ঝাউ-এর ঝাড়ে বাজায় বাঁশি পউষ-পাগল বুড়ি,—
আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শিদা-গান জুড়ি।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে জানি জানিইনেক বসা।'

কবর

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া গেল কারা।
সোনালি উষায় সোনামুখে তার আমার নয়ন ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তার দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোটোখাটো তার হাসিব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
'আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।'
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি ছ'পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার এক ছড়া নিতে কখনো হতো না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেসো না—হেসো না—শোনো দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হতো দেখতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে হাসিয়া কহিত, 'এতদিন পরে এলে,
পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।'
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু 'আয় খোদা! দয়াময়!
আমার দাদির তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।'

* * * *

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি,
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।

শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গনিয়া গনিয়া ভুল করে গনি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি, মাটিতে লাগায়ে বুক,
আয়—আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ!

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরান যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
'বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।'
ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে
তুমি যে কহিলা, 'বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?'
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি,
গাছের পাতার সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনি হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শূনো-মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো-পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহিন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পল্লী-বালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণবিষের তাজ।

মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, 'বাছারে, যাই,
বড় ব্যথা রোলো দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই,
দুলাল আমার, যাদুরে আমার লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা, ছাড়িয়া যাইতে তোরে!'
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল,—'আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার "মাথাল" খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।'
সেই সে মাথাল পড়েছে গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরানের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখার স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনকি মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, 'রহমান খোদা! আয়,
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!'

এইখানে তোর বু-জির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের ঘরে বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বু-জিরে তাহারা ভালোবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, 'দাদু যেন কাল এসে,
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।'
শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে, ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু, ধীরে।

* * * *

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীন।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু! 'আয় খোদা! দয়াময়!
আমার বু-জির তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।'

হেথায় ঘুমায় তোর ছোটো ফুপু সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোটো বয়সেই মায়েরে হারায়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা।
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে,
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গেছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর-ধর—বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে এই কবরের পাশে, আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস নাকো, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখো দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে!

* * * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড়ো সাধ আজ লাগে।
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড়ো সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড় হাতে দাদু মোনাজাত করি, 'আয় খোদা! রহমান,
ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।'

শাকতুলুনী

ও কার বউ এল আজ মটর খেতে শাক তুলিতে,
সবুজ গাঙে সোনার কমল কে এল রে ভাসিয়ে দিতে।
সিঁদুরফাটা মুখখানিরে হাঁটুর নীচে করিয়ে নত,
কচি ডগা ধরতে ধীরে সোহাগে সে হচ্ছে ক্ষত।
ফাগ-রাঙা বউ মটর-শুঁটি আবছা হাসে পাতার ফাঁকে,
শাক-ভাঙা বউ নত হয়ে ঘোমটা তলে সিঁদুর আঁকে।
মটর-শুঁটির বাজে পাতা, বধূর হাতের বাজে চুড়ি
বধূ দোলে সোহাগ ভরে বাতাসে দোলায় মটর-কুঁড়ি।

চলতে পথে পথিক ভাবে, কার পানে আজ ফিরাই আঁখি,
দীঘির রাঙা নালের বনে রক্ত মরাল ফিরছে নাকি।
পায়ের দুখান খাড়ু নিয়েই গেঁয়ো বালার মহা বিপদ,
যতই টানে জড়িয়ে ধরে মটর-শুঁটির পাতার আপদ।
হুল করে সে খায় গো আছাড় লুটিয়ে পড়ে মটর খেতে,
বুকে মুখে ফুলগুলি সব জড়ায় তারে হর্ষে মেতে।

কৃষাণ-দুলালী

কলমিলতা শাড়ি মেয়ের, কলমি-রাঙা মুখ,
ঠোঁট দুখানি সিঁদুর-ভাঙা রাঙা যে টুকটুক্
গলায় তাহার পুঁতির মালা ; কানে ফুলের দুল,—
এ গাঁয়ের ও চাষীর মেয়ে হয় না যেন ভুল।
গয়না তাহার নাইকো গায়ের রূপ করে টলমল,
রঙ-রাঙা অঙ্গ যেন গয়না ঝলমল।
রূপ-মুখরা রূপার খাড়ু পা দুখানি ধরে,
ঝুমুর-ঝুমুর চাষী মেয়ের রূপেরই গান করে।
হেলায় তনু, এলায় চিকুর, দোলায় সরু কাঁখ,
পেখম-পরা ময়ূর লাজে নীপ-বনে নির্বাক।

বাহুতে তার তাবিজ বাঁধা গেঁয়ো পীরের দান,
ঝুমকো তেঁড়ির প্রেম-আলাপন শুনছে নিতুই কান
বারে বারে ঘোমটা খসে লাজ-মেশা নিলাজ,
পুতুলটিরে বউ সাজাতে নিজেরও বউ সাজ।
এক পুতুলে আদর করে আরেক পুতুল লয়ে,
কোনটি পুতুল, কোনটি যে নয় যায় যে রে ভুল হয়ে।
নামটি মেয়ের জানি নাকো নাম জানি তার শাড়ির,
কলমিলতা শাড়ির চেয়ে মিঠেবা নাম তারির।
ওর সাথে মোর একটু যদি থাকত পরিচয়,
শিখে নিতেম কেমন করে 'বৌ-কথা-কও' কয়।
শিখে নিতেম কেমন করে পাকা পুঁই-এর ফলে,
হেনা ফেলে লাল টুকটুক করে চরণ তলে;
শিখে নিতেম কোথায় মাঠে পাটবনেরই মূল
বউ-টুবানীর ফুলগুলি সব নাড়ছে নোলক-দুল।
আমার তো আর নেইকো পুতুল শাপলা-কুসুম ধরে
সাজিয়ে তাহার ঈষৎ হাসি নিতুম ছড়ায় ভরে।

বোশেখ শেষের মাঠ

বোশেখ শেষে বালুচরের বোরো ধানের থান,
সোনায় সোনা মেলিয়ে দিয়ে নিয়েছে কেড়ে প্রাণ।
বসন্ত সে বিদায় বেলায় বুকের আঁচলখানি,
গেঁয়ো নদীর দুপাশ দিয়ে রেখায় গেছে টানি।
চৈত্রদিনের বিধবা চরের সাদা ধানের পরে,
নতুন বরষ ছড়িয়ে দিল সবুজ থরে থরে
না জানি কোন গেঁয়ো তাঁতি গাঙ চলিবার ছলে,
জল-ছোঁয়া তার শাড়ির কোণে পাড় বুনে যায় চলে।
মধ্য চরে আউশ ধানের সবুজ পারাবার,
নদীর ধারে বোরো ধানের দোলে সোনার পাড়।
চৈত্রদিনের বৈরাগিনী সবুজ আঁচল সনে,
মুখখানিরে আবছা ঢেকে সাজল বিয়ের কনে।

মাথায় তাহার বক-শিশুরা মেলি কোমল ডানা,
সাদা সাদা মেঘের মতো উড়ায় চাদরখানা।
গেঁয়ো পথে চলতে আজি অনেক মায়া লাগে,
বুকের পরে পা দিলে ধান জড়িয়ে ধরে তাকে।
অমন সবুজ অমন কোমল মাটির সাথে মিশে,
কে পারে ভাই চলতে তারে পায়ের তলে পিষে।
হাটে যাওয়ার পথটি তো তাই অনেক হলো ঘোর,
কাজল-তলার ওপাশ দিয়ে দিঙনগরের-মোড় ;
তার পরেতে হালট গেছে একটু আঁকা-বাঁকা,
গরুর পায়ের ক্ষুরে ক্ষুরে ছবির মতো আঁকা।
সেখান দিয়ে চলতে চাষী সকল কথা ভোলে,
বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধরে ধানের কথা তোলে।
সাত পুরুষে এমন ফসল দেখিনি কেউ চোখে,
মেঘ যেন কেউ বিছিয়ে দেছে তাদের গেঁয়ো চকে।
চাষীর মুখে তারিফ শুনে ধান শিশুরা তাই,
হেলে দুলে লাজে আকুল নাই লুকাবার ঠাঁই।
আকাশ ছিল সুনীল যখন ছিল না মেঘ লেখা,
তখন চাষী শুকনো মাঠে দিয়ে লাঙল-রেখা ;
আকাশের ওই দেবতা সাথে পেতেই যেন আড়ি,
ধুল ধুলা ধুল চোতের ধুলায় ধানকে দিল ছাড়ি।
তারা যেন সৈন্য তাহার পাতাল-পাথার ফাঁড়ি,
আনল অথই মেঘের বাহার সবুজ স্নেহে কাড়ি।
আকাশ হতে নামল না মেঘ পাতাল হতে আনি,
সারা মাঠের বুকের পরে হর্ষে দিল টানি।
দেবতা যেন হারায় ভয়ে সুনীল আকাশ থেকে,
চাষার সবুজ খেতের পরে বর্ষে হেঁকে হেঁকে।
ওগো চাষী! গাঁয়ের চাষী! সেলাম তোমার পায়,
বাড়ি তোর উজান চরে কিংবা গফর গাঁয় ;
ম্যালেরিয়ায় মরছ তুমি রুগ্‌ণ জবুথবু ;
সারাটি দিন মরছ খেটে পাও না খেতে তবু।
লক্ষ টাকা দেশকে দিয়ে হয়নি তোমার নাম,
দেশের তরে প্রাণ দেবে কি? নয় সে তোমার কাম।

একলা যে কোন বনের ধারে নাম-না-জানা গাঁয়,
সারাটা দিন রৌদ্রে পুড়ে সাজাও মেঠো মায়।
সব দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে ভুক,
অভাগারা তাও বোঝে না এইটে বড়ো দুখ।
খোদার ছোটো যদিও তুমি, অনেক ছোটো নয়,
সৃষ্টি করার চাইতে পালন তুচ্ছ কেবা কয়।
তোমার গেঁয়ো মাঠটি আমার মক্কা হেন স্থান,
সাধ করে আজ লুটিয়ে সেথা জুড়াই সকল প্রাণ।

নক্সী-কাঁথার মাঠ

দুই

এক কালা দতের কালি যা দ্যা কলম লেখি,
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি,
—ও কালা, ঘরে বইতে দিলি না আমারে।
—মুর্শিদা গান

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া।
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষী,
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।
কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময় ;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার,
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল-সুন্দী-বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল[1] লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছে হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামি,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

তিন

চন্দনের বিন্দু বিন্দু কাজলের ফোঁটা
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলির ছটা
—মুর্শিদা গান

ওই গাঁখানি কালো কালো, তারি হেলান দিয়ে,
ঘরখানি যে দাঁড়িয়ে হাসে ছোনের ছানি নিয়ে;
সেইখানি এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোনা,
সাজু[2] বলেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা[3]।

১। পাগাল - ইস্পাত

২। সাজু = পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো জেলায় বাপের বাড়িতে মুসলমান মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকা হয় না। বড় মেয়েকে বড়ু, মেজো মেয়েকে মাজু, সেজো মেয়েকে সাজু এইভাবে ডাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকে কিন্তু এ নামে ডাকিতে পারে না।

৩। গোনা = পাপ

লাল মোরগের পাশার মতো ওড়ে তাহার শাড়ি,
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি
মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে,
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।
ফুল ঝর-ঝর জন্তি গাছে জড়িয়ে কেবা শাড়ি,
আদর করে রেখেছে আজ চাষীদের ওই বাড়ি;
যে ফুল ফোটে সোনের খেতে, ফোটে কদম গাছে,
সকল ফুলের ঝলমল গা-ভরি তার নাচে।
কচি কচি হাত-পা সাজুর, সোনায় সোনার খেলা,
তুলসী তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।
গাঁদাফুলের রঙ দেখেছি, আর যে চাঁপার কলি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি?
রামধনুকে না দেখিলে কী-ই বা ছিল ক্ষোভ,
পাটের বনের বউ-টুবানী[1], নাইক দেখার লোভ।
দেখেছি এই চাষীর মেয়ের সহজ গেঁয়ো রূপ,
তুলসী-ফুলের মঞ্জরী কি দেব-দেউলের ধূপ!
দু-একখানা গয়না গায়ে, সোনার দেবালয়ে,
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার না পূজা বয়ে।
পড়শিরা কয়—মেয়ে ত নয়, হলদে পাখির ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

এমন মেয়ে—বাবা ত নেই, কেবল আছেন মা;
গাঁওবাসীরা তাই বলে তায় কম জানিত না;
তাহার মতন চেকন 'সেওই' কে কাটিতে পারে,
নকসী করা 'পাকান পিঠায়' সবাই তারে হারে।
হাঁড়ির উপর চিত্র করা শিকেয় তোলা ফুল,
এই গাঁয়েতে তাহার মতো নাইক সমতুল।
বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে,
'সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে'—বলে কি লোক সাধে?

---

[1] বউ-টুবানী = মাঠের ফুল

দশ

খড়ো ঘর বান্দাছাও সোনাভাই বড়ো করছাও আশা
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খী ছাড়বে বাসা।
—মুর্শিদা গান

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।
মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গেহ কাজে,
দুইখানে হতে দুটি সুর যেন এ উহারে ডেকে বাজে।
ঘর চেয়ে থাকে কেন মাঠ পানে, মাঠ কেন ঘর পানে,
দুইখানে রহি দুইজন আজি বুঝিছে ইহার মানে।

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হলদি-কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমিলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়!
আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চাদর বিছায়ে হলুদবরন ধানে।

আজকে রূপার বড়ো কাজ—কাজ—কোনো অবসর নাই,
মাঠে যেই ধান ধরে নাকো আজি ঘরে দেবে তারে ঠাঁই।
সারা মাঠে ধান, পথে ঘাটে ধান উঠানেতে ছড়াছড়ি,
সারা গাঁও ভরি চলেছে কে কবি ধানের কাব্য পড়ি।
আজকে রূপার মনে পড়ে নাকো শাপলার লতা দিয়ে,
নয়া গৃহিণীর খোঁপা বেঁধে দিত চুলগুলি তার নিয়ে;
সিঁদুর লইয়া মান হয় নাকো বাজে না বাঁশের বাঁশি,
শুধু কাজ—কাজ, কী যাদু-মন্ত্র ধানেরা পড়িছে আসি!
সারাটি বরষা কে কবি বসিয়া বেঁধেছে ধানের গান,
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী করিয়া সে অবসান।
আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বুঝি সারা,
ছুটে গেঁয়ো পাখি ফিঙে বুলবুল তারি গানে হয়ে হারা।
কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো;
এত কাজ তবু হাসি ধরে নাকো, মুখ ফুল ফুটো ফুটো!

আজকে তাহার পাড়া-বেড়ানোর অবসর মোটে নাই,
পার খাড়্গাছি কোথা পড়ে আছে, কেবা খোঁজ রাখে ছাই!
অর্ধেক রাত উঠানেতে হয় ধানের মলন মলা,
বনের পশুরা মানুষের কাজে মিশায় গলায় গলা।
দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি,
ঢেঁকির পাড়েতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ি।
কোনো দিন চাষী শুইয়া শুইয়া গাহে বিরহের গান,
কৃষাণের নারী ঘুমাইয়া পড়ে, ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।
হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তারে হয়রান হয়ে ডুবে যায় রাতারাতি।

এমনি করিয়া ধানের কাব্য হইয়া আসিল সারা,
গানের কাব্য আরম্ভ হলো সারাটা কৃষাণপাড়া!
রাতেরে উহারা মানিবে না যেন, নতুন গলার গানে,
বাঁশি বাজাইয়া আজকে রাতের করিবে নতুন মানে।
আজিকে রূপার কোনো কাজ নাই, ঘুম হতে যেন জাগি,
শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী তাহারই ব্যথার ভাগী।
সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি,
ঘুম হতে তারে সবে জাগায়েছে অরুণ-আলোয় সাজি।
নতুন করিয়া আজিকে উহারা চাহিছে এ ওর পানে,
দীর্ঘ কাজের অবসর যেন কহিছে নতুন মানে!
নতুন চাষার নতুন চাষাণী নতুন বেঁধেছে ঘর,
সোহাগে আদরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নড়বড়!
বাঁশের বাঁশিতে ঘুণ ধরেছিল, এত দিন পরে আজ,
তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।
সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশি,
মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি!

ক্রমে রাত বাড়ে, বউ বসে দূরে, দুটি চোখ ঘুমে ভার,
‘পায়ে পড়ি ওগো চলো শুতে যাই, ভালো লাগে নাকো আর।’
রূপা ত সে কথা শোনেইনি যেন, বাঁশি বাজে সুরে সুরে,
‘ঘরে দেখে যারে সেই যেন আজি ফেরে ওই দূরে দূরে।’

বউ রাগ করে, 'দেখো, বলে রাখি, ভালো হবে নাকো পরে,
কালকের মতো করি যদি তবে দেখিও মজাটি করে।
ওমনি করিয়া সারারাত আজি বাজাইবে যদি বাঁশি,
সিঁদুর আজিকে পরিব না ভালে, কাজল হইবে বাসি।
দেখো, কথা শোনো, নইলে এখনি খুলিব কানের দুল,
আজকে ত আমি খোঁপা বাঁধিব না, আলগা রহিবে চুল।'
বেচারি রূপাই বাঁশি বাজাইতে এমনি অত্যাচার,
কৃষাণের ছেলে! অত কিবা বোঝে, তখনই মানিল হার।
কহে জোড়করে, 'শোনো গো হুজুর, অধম বাঁশির প্রতি,
মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।
আজকে ও-ভালে সিঁদুর দিবে না, খুলিবে কানের দুল,
সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের—ভোরে হাসিবে না ফুল!
এত বড়ো কথা! আচ্ছা দেখাই, ওরে ও অধম বাঁশি,
এই তরুণীর অধরের গানে তোমার হইবে ফাঁসি।'

হাতে লয়ে বাঁশি বাজাইল রূপা মাঠের চিকন সুরে,
কভু দোলাইয়া বউটির ঠোঁটে কভু তারে ঘুরে ঘুরে।
বউটি যেন গো হেসে হয়রান, কহে ঠোঁটে ঠোঁট চাপি,
'বাঁশির দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজাল সেই পাপী?'
পুনঃ জোর করে রূপা কহে, 'এই অধমের অপরাধ,
ভয়ানক যদি, দণ্ড তাহার কিছু কম নিতে সাধ!'
রূপার বলার এমনি ভঙ্গি বউ হেসে কুটি কুটি,
কখনও পড়িছে মাটিতে ঢলিয়া, কভু গায়ে পড়ে লুটি।
পরে কহে, 'দেখো, আরও কাছে এসো, বাঁশিটি লও ত হাতে
এমনি করিয়া দোলাও ত দেখি নোলক দোলার সাথে!'

বাঁশি বাজে আর নোলক যে দোলে, বউ কহে আর বার,
'আচ্ছা আমার বাহুটি নাকি গো সোনালি লতার হার?
এই ঘুরালেম, বাজাও ত দেখি এরি মতো কোনো সুর,'
তেমনি বাহুর পরশের মতো বাজে বাঁশি সুমধুর!
দুটি করে রাঙা ঠোঁটখানি টেনে কহে বউ, 'এরি মতো,
তোমার বাঁশিতে সুর যদি থাকে বাজাইলে বেশ হতো!'

চলে মেঠো বাঁশি দুটি ঠোঁট ছুঁয়ে কলমি ফুলের বুকে,
ছোটো চুমু রাখি চলে যেন বাঁশি, চলে সে যে কোন লোকে।
এমনি করিয়া রাত কেটে যায় ; হাসে রবি ধীরি ধীরি,
বেড়ার ফাকেতে উঁকি মেরে দেখি দুটি খেয়ালির ছিরি।

সেদিন রাত্রে বাঁশি শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে,
তারি রাঙা মুখে বাঁশি-সুরে রূপা বাঁকা-চাঁদ এনে ধরে।
তারপরে, খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম-ফুলেতে রাঙা পাও দুটি দেখে আরো রাঙা করি,
মৃদু তালে তালে নিঃশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।
ভাবে রূপা, ও-যে দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল!
হায় রূপা, তুই চোখের কাজলে আঁকিলি মোহন ছবি,
এতটুকু ব্যথা না লাগিতে যে রে ধুয়ে যাবে তোর সবি!
ওই বাহু আর ওই তনু-লতা ভাসিছে সোঁতের ফুল,
সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসিয়া যাইবে ভাঙিয়া রূপার কূল।
বাঁশি লয়ে রূপা বাজাতে বসিল বড়ো ব্যথা তার মনে,
উদাসিয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে।

ধারায় ধারায় জল ছুটে যায় রূপার দুচোখ বেয়ে,
বউটি তখন জাগিয়া উঠিল তাহার পরশ পেয়ে।
"ওমা ওকী? তুমি এখনো শোওনি! খোলা কেন মোর চুল?
একি! দুই পায়ে কে দেছে ঘষিয়া রঙিন কুসুম ফুল?
ওকী! ওকী!! তুমি কাঁদছিলে বুঝি! কেন কাঁদছিলে বলো?"
বলিতে বলিতে বউটির চোখ জলে করে ছল ছল!
বাহুখানা তার কাঁধ পরে রাখি রূপা কয় মৃদু সুরে,
'শোনো শোনো সই, কে যেন তোমায় নিয়ে যেতে চায় দূরে!
'সে দূর কোথায়?' 'অনেক—অনেক—দেশ যেতে হয় ছেড়ে,
সেথা কেউ নাই শুধু তুমি আর সেই সে অচেনা ফেরে।
তুমি ঘুমাইলে সে এসে আমায় কয়ে যায় কানে কানে,
যাই—যাই—ওরে নিয়ে যাই আমি আমার দেশের পানে।

বলো, তুমি সেথা কখনো যাবে না, সত্য করিয়া বলো।'
'নয়! নয়! নয়!' বউ কহে তার চোখ দুটি ছলছল।

রূপা কয় 'শোনো সোনার বরনি, আমার এ কুঁড়ে ঘর,
তোমার রূপের উপহাস শুধু করে সারাদিন ভর।
তুমি ফুল! তব ফুলের গায়েতে বহে বিহানের বায়ু,
আমি কাঁদি সই রোদ উঠিলে যে ফুরাবে রঙের আয়ু।
আহা আহা সখি, তুমি যাহা করো, মোর মনে লয় তাই,
তোমার ফুলের পরানে কেবল দিয়ে যায় বেদনাই।'
এমন সময় বাহির হইতে বছির মামুর ডাকে,
ধড়মড় করি উঠিয়া রূপাই চাহিল বেড়ার ফাঁকে।

এগারো

সাজ সাজ বলিয়া রে শহরে পৈল সাড়া,
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া।
প্রথমে সাজিল মর্দ আম্বুদি ডগরী,
পাঁচ কাঠা ভুঁই জুইড়া বসে মর্দ এয়সা ভারি।
তারপরে, সাজিল মর্দ তুরুক আমানি,
সমুদ্দুরে নামলে তার হৈত আঁটুপানি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে লোহাজুড়ী
আছড়াইয়া মারত সে হাতির শুঁড় ধরি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে আইন্দা ছাইন্দা,
বাইশ মণ তামাক নেয় তার লেংটির মধ্যে বাইন্ধা।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে মদন ঢুলি,
বাইশ মণ পিতল তার ঢোলের চারটা খুলী।
আতালী পাতালী সাজে গগনেরী ঢেঁটা,
মেঘনাল সাজিয়া আইল তাম তুরুকের বেটা।
তুগুলি মুগুলি সাজে তারা দুই ভাই,
ঐরাবতে সাইজা আইল আজদাহা সেপাই।
বন্দুকি বন্দুকি চলে কামানে কামান,
ময়ূর-নয়ূরী চলে ধরিয়া পয়গাম।

—মহরমের জারী

'ও রূপা তুই করিস কী রে? এখনো তুই রইলি শুয়ে?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খামার ভুঁয়ে।"
'কি বলিলা বছির মামু?' উঠল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া,
আগুনভরা দুচোখ হতে গোল্লা-বারুদ যায় উড়িয়া।
পাটার মতো বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে,
বুকের হাড়ে লাগল বাড়ি, আগুন বুঝি জ্বলবে তাতে!
লম্ফে রূপা আনল পেড়ে চাং হতে তার সড়কি খানা,
ঢাল ঝুলায়ে মাজার সাথে থালে থালে মারল হানা।
কোথায় রল রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিঞা,
সাউদ পাড়ার খাঁরা কোথায়? কাজির পোরে[1] আন ডাকিয়া?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় থাকতে মোরা গফর-গাঁয়ে,
এই কথা আজ শোনার আগে মরিনি ক্যান্ গোরের ছায়ে?
'আলী— আলী[2]' হাঁকল রূপাই, হুংকারে তার গগন ফাটে,
হুংকারে তার গর্জে বছির আগুন যেন ধরল কাঠে।
ঘুম হতে সব গাঁয়ের লোকে শুনল যেন রূপার বারি;
আকাশ হতে ভাঙছে ঠাটা[3], মেঘে মেঘে লাগছে বাড়ি।
ডাক শুনে তার আসল ছুটে রহম চাচা, ছমির মিঞা,
আসল হেঁকে কাজেম খুনী নখে নখে আঁচড় দিয়া।
আসল হেঁকে গাঁয়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পরি,
এক নিমিষে গাঁয়ের লোকে রূপার বাড়ি ফেলল ভরি।
লম্ফে দাঁড়ায় ছমির লেঠেল, মমিনপুরের চর দখলে,
এক লাঠিতে একশ লোকের মাথা যে জন আসল দলে।
দাঁড়ায় গাঁয়ের ছমির বুড়ো, বয়স তাহার যদিও আশি,
গায়ে তাহার আজও আছে একশো লড়ার দাগের রাশি।

গর্জি উঠে গদাই ভুঁঞা, মোহন ভুঁঞার ভাজন[4] বেটা,
যার লাঠিতে মামুদপুরের নীল কুঠিতে লাগল লেঠা।

১। পো = ছেলে।

২। আলী = হজরত আলী; হজরত মুহম্মদের (দঃ) জামাতা। তিনি মহাবীর ছিলেন
এদেশে মারামারির সময় সকলে মিলিয়া 'আলী আলী' শব্দ করে। কারও কারও মতে
'আলী' 'আল্লা' শব্দের অপভ্রংশ।

৩। ঠাটা = অশনি।

৪। ভাজন = ঔরসজাত।

সব গাঁর লোক এক হল আজ রূপার ছোটো উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশির স্বরে।

রূপা তখন বেড়িয়ে তাদের বলল, 'শোনো ভাই সকলে
গাজনা চরের ধানের জমি আর আমাদের নাই দখলে।'
বছির মামু বলছে খবর—মোল্লারা সব কালকে নাকি;
আধেক জমির ধান কেটেছে, আধেক আজও রইছে বাকি।
'মোদের খেতে ধান কেটেছে, কালকে যারা কাঁচির[1] খোঁচায়
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায়।'
থামল রূপাই—ঠাটা যেমন মেঘের বুকে বাণ হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশির সুর হাঁকিয়া!
গর্জে উঠে গাঁয়ের লোকে, লাটিম হেন ঘোড়ায় লাঠি,
রোহিত মাছের মতন চলে, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।
রূপাই তাদের বেড়িয়ে বলে, 'থাল বাজা রে থাল বাজা রে,
থাল বাজা রে সড়কি ঘুরা হানরে লাঠি এক হাজারে।
হান্ রে লাঠি— হান্ রে কুঠার, গাছের ছ্যান[2] আর রাম-দা ঘুরা,
হাতের মাথায় যা পাস যেথায় তাই লয়ে আজ আয়রে তোরা।'
'আলী! আলী! আলী!! আলী!!!' রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি,
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে কাঁপছে আকাশ কাঁপছে মাটি।
তারি সুরে সব লেঠেলে লাঠির পরে হানল লাঠি,
'আলী-আলী' শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি।
আগে আগে ছুটল রূপা—বোঁ বোঁ বোঁ সড়কি ঘোরে,
কালসাপের ফণার মতো বাবরি মাথার চুল যে ওড়ে
চলল পাছে হাজার লেঠেল 'আলী-আলী' শব্দ করি,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধূলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি!
চলল তারা মাঠ পেরিয়ে চলল তারা বিল ডিঙিয়ে
কখন ছুটে কখন হেঁটে বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চলল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে যায়,
বাও কুড়ানির মতন তারা উড়িয়ে ধূলি পথ ভরি হায়।

১। কাঁচির = কাস্তের।
২। গাছের ছ্যান = খেজুর গাছের ডগা কাটবার অস্ত্র।

দুপুর বেলা এল রূপাই গাজনা চরের মাঠের পরে,
সঙ্গে এল হাজার লেঠেল সড়কি লাঠি হস্তে ধরে!
লম্ফে রূপা শূন্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে,
থাকল খানিক মাঠের মাটি দন্ত দিয়ে কামড়ে ধরে।
মাটির সাথে মুখ লাগায়ে, মাটির সাথে বুক লাগায়ে,
'আলী! আলী!!' শব্দ করি মাটি বুঝি দ্যায় ফাটায়ে।
হাজার লেঠেল হুংকারি কয় 'আলী আলী হজরত আলী,'
সুর শুনে তার বন-গেঁয়োদের কর্ণে বুঝি লাগল তালি!
তারাও সবে আসল জুটে দলে দলে ভীম পালোয়ান,
'আলী আলী' শব্দে যেন পড়ল ভেঙে সকল গাঁখান!
সামনে চেয়ে দেখল রূপা সার বেঁধে সব আসছে তারা,
ওপার মাঠের কোল ঘেঁষে কে বাঁকা তীরে দিচ্ছে নাড়া।
রূপার দলে এগোয় যখন, তারা তখন পিছিয়ে চলে,
তারা আবার এগিয়ে এলে এরা হটে নানান কলে।
এমনি করে সাত আটবারে এগোন পিছন হলো যখন,
রূপা বলে, 'এমন করে 'কাইজা' করা হয় না কখন!'
তাল ঠুকিয়া ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি,
'আলী-আলী -- হজরত আলী' কণ্ঠ তাদের যায় যে ফাটি।
তাল ঠুকিয়া পড়ল তারা বন-গেঁয়োদের দলের মাঝে,
লাঠির আগায় লাগল লাঠি, লাঠির আগায় সড়কি বাজে।
'মার মার মার' হাঁকল রূপা,— 'মার মার মার' ঘুরায় লাঠি,
ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠে,
জীবনের এক সত্য মহান লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে!
মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,
মহাকালের বাজছে বিষাণ আজকে ধরার প্রলয় কালে।
নাচে রূপা— নাচে রূপা--লোহুর গাঙে সিনান করি,
মরণরে সে ফেলছে ছুঁড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।
নাচে রূপা--- নাচে রূপা--মুখে তাহার অট্টহাসি,
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।
—হাড়ে হাড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন
কী যেন সে দেখেছে আজ, রুধতে নারে তারি মাতন।

বন-গেঁয়োরা পালিয়ে গেল, রূপার লোকও ফিরল বহু,
রূপা তবু নাচছে, গায়ে তাজা-খুনের হাসছে লোহু।

তেরো

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে।
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যায়া দিতাম দেখা;
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশে রে।
আমরা ত অবলা নারী,
তরুতলে বাসা বান্ধি রে;
আমার বদন চুয়ায়া পড় ঘাম রে।
বন্ধুর বাড়ি গঙ্গার পার
গেলে না আসিব আর;
আমার না-জান বন্ধু, না জানে সাঁতার রে।
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়া আইসা দেখা দাও
তুমি দাও দেখা জুড়াক পরাণ রে।
—রাখালী গান

একটি বছর হইয়াছে সেই রূপাই গিয়াছে চলি,
দিনে দিনে দিন নব আশা লয়ে সাজুরে গিয়াছে ছলি।
কাইজায় যারা গিয়াছিল গাঁর, তারা ফিরিয়াছে বাড়ি,
শহরের জজ, মামলা হইতে সবারে দিয়াছে ছাড়ি।
স্বামীর বাড়িতে একা মেয়ে সাজু কী করে থাকিতে পারে,
তাহার মায়ের নিকটে সকলে আনিয়া রাখিল তারে।
একটি বছর কেটেছে সাজুর একটি যুগের মতো,
প্রতিদিন আসি, বুকখানি তার করিয়াছে শুধু ক্ষত।
ও-গাঁয়ে রূপার ভাঙা ঘরখানি মেঘ ও বাতাসে হায়,
খুঁটি ভেঙে আজ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে পথের গায়।
প্রতি পলে পলে খসিয়া পড়িছে তাহার চালের ছানি,
তারও চেয়ে আজি জীর্ণ শীর্ণ সাজুর হৃদয়খানি।
দুখের রজনী যদিও বা কাটে—আসে যে দুখের দিন,
রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীন।

কৃষাণীর মেয়ে, এতটুকু বুক, এতটুকু তার প্রাণ,
কী করিয়া সহে দুনিয়া জুড়িয়া অসহ দুখের দান!
কেন বিধি তারে এত দুখ দিল, কেন, কেন, হায় কেন,
মনের-মতন কাঁদায় তাহারে 'পথের কাঙালী' হেন?

সোঁতের শেহলা ভাসে সোঁতে সোঁতে, সোঁতে সোঁতে ভাসে পানা,
দুখের সাগরে ভাসিছে তেমনি সাজুর হৃদয়খানা।
কোন জালুয়ার[১] মাছ সে খেয়েছে নাহি দিয়ে তার কড়ি,
তারি অভিশাপ ফিরিছে কি তার সকল পরান ভরি!
কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিঁড়েছিল নিজ হাতে,
তাহারই ছোঁয়া কি লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে!
তোর দেশে বুঝি দয়া মায়া নাই, হা-রে নিদারুণ বিধি
কোন প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার আঁচলের নিধি।
নয়ন হইতে উড়ে গেছে হায় তার নয়নের তোতা,
যে ব্যথারে সাজু বলিতে পারে না, আজ তা রাখিবে কোথা?
এমনি করিয়া কাঁদিয়া সাজুর সারাটি দিবস কাটে,
আনমনে কভু একা চেয়ে রয় দীঘল গাঁয়ের বাটে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকাল যে কাটে—দুপুর কাটিয়া যায়,
সন্ধ্যার কোলে দীপ নিবু-নিবু সোনালি মেঘের নায়।
তবু ত আসে না। বুকখানি সাজু নখে নখে আজ ধরে,
পারে যদি তবে ছিঁড়িয়া ফেলায় সন্ধ্যার কাল গোরে।

মেয়ের এমন দশা দেখে মার সুখ নাই কোনো মনে,
রূপারে তোমরা দেখেছ কি কেউ, শুধায় সে জনে জনে।
গাঁয়ের সবাই অন্ধ হয়েছে, এত লোক হাটে যায়,
কোনো দিন কিগো রূপাই তাদের চক্ষে পড়েনি হায়!
খুব ভালো করে খোঁজে যেন তারে, বুড়ি ভাবে মনে মনে,
রূপাই কোথাও পালাইয়া আছে হয়তো হাটের কোণে।
ভাদ্র মাসেতে পাটের বেপারে কেউ কেউ যায় গাঁর,
নানা দেশে তারা নাও বেয়ে যায় পদ্মানদীর পার।

১। জালুয়া = জেলে।

জনে জনে বুড়ি বলে দেয়, 'দেখো, যখন যেখানে যাও,
রূপার তোমরা তালাস লইও, খোদার কছম খাও।'
বর্ষার শেষে আনন্দে তারা ফিরে আসে নায়ে নায়ে,
বুড়ি ডেকে কয়, 'রূপারে তোমরা দেখ নাই কোনো গাঁয়ে।'
বুড়ির কথার উত্তর দিতে তারা নাহি পায় ভাষা,
কী করিয়া কহে, আর আসিবে না যে পাখি ছেড়েছে বাসা।

চৈত্র মাসেতে পশ্চিম হতে জন খাটিবার তরে,
মাথাল মাথায় বিদেশী চাষিরা সারা গাঁও ফেলে ভরে।
সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
তামাক খাইতে হুঁকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে ;
'তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথাও কারে,
নিটোল তাহার গঠন গাঠন, কথা কয় ভারে ভারে।'
এমনি করিয়া বলে বুড়ি কথা, তাহারা চাহিয়া রয়,—
রূপারে যে তারা দেখে নাই কোথা, কেমন করিয়া কয়।
যে গাছ ভেঙেছে ঝড়িয়া বাতাসে কেমন করিয়া হায়,
তারি ডালগুলো ভেঙে যাবে তারা কঠোর কুঠার-ঘায়?
কেউ কেউ বলে, 'তাহারি মতন দেখেছিনু একজনে,
আমাদের সেই ছোটো গাঁর পথে চলে যেতে আনমনে।'
'আচ্ছা, তাহারে শুধাওনি কেহ, কখন আসিবে বাড়ি,
পরদেশে সে যে কোন প্রাণে রয় আমার সাজুরে ছাড়ি?'
গাঙে-পড়া-লোক যেমন করিয়া তৃণটি আঁকড়ি ধরে,
তেমনি করিয়া চেয়ে রয় বুড়ি তাদের মুখের পরে।
মিথ্যা করেই তারা বলে, 'সে যে আসিবে ভাদ্র মাসে,
খবর দিয়েছে, বুড়ি যেন আর কাঁদে না তাহার আশে!'
এত যে বেদনা তবু তারি মাঝে একটু আশার কথা,
মুহূর্তে যেন মুছাইয়া দেয় কত বরষের ব্যথা।
মেয়েরে ডাকিয়া বার বার কহে 'ভাবিস না মাগো আর,
বিদেশী চাষীরা কয়ে গেল মোরে— খবর পেয়েছে তার।'
মেয়ে শুধু দুটি ভাষা-ভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে ;
কত ব্যথা তার কমিল ইহাতে সেই তাহা আজ জানে।
গনিতে গনিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,
বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল বুকের বাস।

আজকে আসিবে কালকে আসিবে, হায় নিদারুণ আশা,
ভোরের পাখির মতন শুধুই ভোরে ছেড়ে যায় বাসা।
আজকে কত না কথা লয়ে যেন বাজিছে বুকের বীনে,
সেই যে প্রথম দেখিল রূপারে বদনা-বিয়ের দিনে।
তারপর, সেই হাট ফেরা পথে তারে দেখিবার তরে,
ছল করে সাজু দাঁড়ায়ে থাকিত গাঁয়ের পথের পরে।
নানা ছুতো ধরি কত উপহার তারে সে যে দিত আনি,
সেই সব কথা আজ তার মনে করিতেছে কানাকানি।
সারা নদী ভরি জাল ফেলে জেলে যেমনি করিয়া টানে,
কখন উঠায়, কখন নামায় যত লয় তার প্রাণে ;
তেমনি সে তার অতীতেরে আজি জালে জড়াইয়া টানে,
যদি কোনো কথা আজিকার দিনে কয়ে যায় নব-মানে।
আর যেন তার কোনো কাজ নাই, অতীত আঁধার গাঙে,
ডুবারুর মতো ডুবিয়া ডুবিয়া মানিক মুকুতা মাঙে।
এতটুকু মান, এতটুকু স্নেহ এতটুকু হাসি খেলা,
তারি সাথে সাজু ভাসাইতে চায় কত না সুখের ভেলা!
হায় অভাগিনী! সে ত নাহি জানে আগে যারা ছিল ফুল,
তারাই আজিকে ভুজঙ্গ হয়ে দহিছে প্রাণের মূল।
যে বাঁশি শুনিয়া ঘুমাইত সাজু, আজি তার কথা স্মরি,
দহন নাগের গলা জড়াইয়া একা জাগে বিভাবরী।

মনে পড়ে আজ সেই শেষ দিনে রূপার বিদায়বাণী—
‘মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পরিও সিঁদুরখানি।’
আরও মনে পড়ে, ‘দীনদুঃখীর যে ছাড়া ভরসা নাই,
সেই আল্লার চরণে আজিকে তোমারে সঁপিয়া যাই।’
হায় হায় পতি, তুমি ত জান না কি নিঠুর তার মন ;
সাজুর বেদনা সকলেই শোনে, ‘শোনে না সে একজন।
গাছের পাতারা ঝরে পড়ে পথে, পশুপাখি কাঁদে বনে,
পাড়া প্রতিবেশী নিতি নিতি এসে কেঁদে যায় তারি সনে।
হায়রে বধির তোর কানে আজ যায় না সাজুর কথা ;
কোথা গেলে সাজু জুড়াইবে এই একবুক-ভরা ব্যথা।
হায় হায় পতি, তুমি ত ছাড়িয়া রয়েছ দূরের দেশে,
আমার জীবন কি করে কাটিবে কয়ে যাও কাছে এসে!

দেখে যাও তুমি দেখে যাও পতি তোমার লাউ-এর লতা,
পাতাগুলি তার উনিয়া পড়েছে লয়ে কি দারুণ ব্যথা।
হালের খেতেতে মন টিকিত না আধা কাজ ফেলে বাকি,
আমারে দেখিতে বাড়ি যে আসিতে করি কতরূপ ফাঁকি।
সেই মোরে ছেড়ে কী করে কাটাও দীর্ঘ বরষ মাস,
বলিতে বলিতে ব্যথার দহনে থেমে আসে যেন শ্বাস।

নকসী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশি বাজায়েছে, সিলাই করেছে সে যে;
গুন্‌গুন্ করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।

সেই কাঁথা আজো মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই।
খুব ধরে ধরে আঁকিল সে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।
আঁকিল কাঁথায়—আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষাণ নারী,
দেখিছে—তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মতো ছাড়ি।
আঁকিতে আঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শুয়ে।
এমনি করিয়া বহুদিন যায়, মানুষে যত না সহে,
তার চেয়ে সাজু অসহ্য ব্যথা আপনার বুকে বহে।
তারপর শেষে এমনি হইল, বেদনার ঘায়ে ঘায়ে,
এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙিল ঝড়িয়া-বায়ে।
কী যেন দারুণ রোগেতে ধরিল, উঠিতে পারে না আর;
শিয়রে বসিয়া দুখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।
হায় অভাগীর একটি মানিক! খোদা, তুমি ফিরে চাও,
এরে যদি নিবে তার আগে তুমি মায়েরে লইয়া যাও!

ফিরে চাও তুমি আল্লা রসুল! রহমান তব নাম,
দুনিয়ায় আর কহিবে না কেহ তারে যদি হও বাম।

মেয়ে কয় 'মাগো! তোমার বেদনা জানি আমি সব জানি,
তার চেয়ে যে গো অসহ্য ব্যথা ভাঙে মোর বুকখানি।
সোনা মা আমার! চক্ষু মুছিয়া কথা শোনো, খাও মাথা,
ঘরের মেঝেতে মেলে ধরো দেখি আমার নকসী-কাঁথা!
একটু আমারে ধরো দেখি মাগো, সূঁচ সুতা দাও হাতে,
শেষ ছবিখানা এঁকে দেখি যদি কোনো সুখ হয় তাতে।'
পাণ্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে সাজু আঁকে খুব ধীরে ধীরে,
আঁকিয়া আঁকিয়া আঁখি জল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।
কাঁথার উপরে আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি ;
রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি বিরহীর বেশে,
অঝোরে বাজায় বাঁশের বাঁশিটি, বুক যায় জলে ভেসে।

মনের মতন আঁকি এই ছবি দেখে বারবার করি,
দুটি পোড়া চোখ বারবার শুধু অশ্রুতে উঠে ভরি।
দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া কহিল মায়েরে ডাকি,
'সোনা মা আমার! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি,
এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে!
সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয়তো আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
হয়তো তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নকসী-কাঁথার পরে।
মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরি বুকে লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায় এরে মেলে দিও তাই!
মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মতো সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।'

বলিতে বলিতে আর যে পারে না, জড়াইয়া আসে কথা,
অচেতন হয়ে পড়িল যে সাজু লয়ে কী দারুণ ব্যথা।

কানের কাছেতে মুখ লয়ে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
'সাজু সাজু! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয়?'
'আল্লা রসুল! আল্লা রসুল!' বুড়ি বলে হাত তুলে,
'দীনদুঃখীর শেষ কান্না এ আজিকে যেয়ো না ভুলে।'
দুই হাতে বুড়ি জড়াইতে যায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে বয়ে যায়, সব খালি! সব খালি!!
'সোনার সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কী করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে।'

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে।

চৌদ্দ

উইড়া যায়রে পঙ্খি পইড়া রয়রে ছায়া ;
দেশের মানুষ দেশে যাইব—কে করিবে মায়া।
—মুর্শিদা গান

আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অথই শূন্য মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি;
ফাগুনের রোদে শুখাইছে যেন কী ব্যথারে মূক মাটির
নিঠুর চাষীরা বুক হতে তার ধানের বসনখানি,
কোন সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হায় টানি!

বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝল মল মল গান,
মাঠের ধুলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয়ে ম্লান!
সোনার সীতারে হরেছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে।
মাঠে মাঠে কাঁদে কলমির লতা, কাঁদে মটরের ফুল,
এই একা মাঠে কী করিয়া তারা রাখিবে গো জাতি-কুল।

লাঙল আজিকে হয়েছে পাগল, কঠিন মাটিরে চিরে,
বুকখানি তার নাড়িয়া নাড়িয়া ঢেলারে ভাঙিবে শিরে।

তবু এই গাঁও রহিয়াছে চেয়ে, ওই গাঁওটির পানে,
কত দিন তারা এমনি কাটাবে কেবা তাহা আজ জানে।
মাঝে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নকসী-কাঁথার মাঠ;
সারা বুক ভরি কী কথা সে লিখি নীরবে করিছে পাঠ!
এমন নাম ত শুনিনি মাঠের? যদি লাগে কারো ধাঁধা,
যারে তারে তুমি শুধাইয়া নিও, নাই কোনো এর বাধা।

সকলেই জানে, সেই কোন কালে রূপা বলে এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমেতে গলায় পড়িল ফাঁসি।
বিয়েও তাদের হয়েছিল ভাই, কিন্তু কপাল-লেখা,
খণ্ডাবে কেবা? দারুণ দুঃখ ভালে এঁকে গেল রেখা।
রূপা এক দিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দূর দেশে,
তারি আশা-পথে চাহিয়া চাহিয়া বউটি মরিল শেষে
মরিবার কালে বলে গিয়েছিল—তাহার নকসী-কাঁথা,
কবরের গায় মেলে দেয় যেন বিরহিণী তার মাতা!

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে,—
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশি বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়!
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কখানা রঙিন শাড়ি,
রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি!
সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই সে নকসী-কাঁথা,—
আজও গাঁর লোকে বাঁশি বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।

কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পরে,—
মহা-শূন্যেতে উড়াইছে কেবা নকসী-কাঁথাটি ধরে;
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশিটি বাজায় করুণ সুরে,
তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ও-গাঁও গহন ব্যথায় ঝুরে।

সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নকসী-কাঁথার মাঠ,
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ।

উড়ানীর চর

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরি।

ঝাঁকে বসে পাখি ঝাঁকে উড়ে যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়;
কিসের মায়ায় বাতাসের গায়
পালক পাতি;
মহা কলতানে বালুয়ার গানে
বেড়ায় মাতি।

উড়ানীর চরে কৃষাণ-বধূর
খড়ের ঘর,
ঢাকাই সিমের উড়িছে আঁচল
মাথার পর।

জাঙলা ভরিয়া লাউ-এর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায়,
নাচিছে ঘুরি;
উড়ানী চরের বুকের আঁচল
কৃষাণ-পুরী।

উড়ানীর চর উড়ে যেতে চায়
হাওয়ার টানে;
চারিধারে জল করে ছল ছল
কী মায়া জানে।

ফাগুনের রোদ উড়াইয়া ধূলি,
বুকের বসন নিতে চায় খুলি,
পদ ধরি জল কলগান তুলি,
    নূপুর নাড়ে ;
উড়ানীর চর চিক চিক করে
    বালুর হারে।

উড়ানীর চরে ছাড়-পাওয়া রোদ
    সাঁঝের বেলা—
বালু লয়ে তারা মাখামাখি করি,
    জমায় খেলা।

কৃষাণী কি বসে সাঁঝের বেলায়
নিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়,
ফাগের মতন কুঁড়া উড়ে যায়।
    আলোক ধারে ;
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে
    গাঙের পারে।

উড়ানীর চরে তৃণের অধরে
    রাতের রানী,
আঁধারের ঢেউ ছোঁয়াইয়া যায়
    কী মায়া টানি।

বিরহী কৃষাণ বাজাইয়া বাঁশি
কাল-রাতে মাখে কাল-ব্যথারাশি;
থেকে থেকে চর শিহরিয়া উঠে
    বালুকা উড়ে ;
উড়ানীর চর ব্যথায় ঘুমায়
    বাঁশির সুরে।

কাল সে আসিবে

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে,
এ পারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে করে।
বুঝি তাই মনে করে,
বাউল বাতাস টানাটানি করে বালুর আঁচল ধরে।
কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মতো,
চখা আর চখি নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষীর ধানের খেতের মতোই তাহার গা,
কোথা বা হলুদ, আবছা হলুদ, কোথা বা হলুদ না।
কাল সে আসিবে, হাসিয়া হাসিয়া রাঙা মুখখানি ভরি,
এপারে আমার পাতার কুটিরে আমি কিবা আজ করি।
কাল সে আসিবে, ওই বালুচরে, এপারে আমার ঘর,
তার পরে নদী—ঘাটের ডিঙ্গা কাঁপে নদীটির পর।
কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িলে, দুলিছে নায়ের পাল,
কারে হারায়েছি, কারে যেন আমি দেখি নাই কত কাল।
ওপারেতে চর বালু লয়ে খেলে, উড়ায় বালুর পথ,
—ওখানে সে কাল দুটি রাঙা পায়ে ভাঙিয়া যাইবে পথ।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়,
আসমান-তারা শাড়িখানি আজ জড়াব সারাটি গায়?

রামলক্ষ্মণ শঙ্খ দুগাছি পরিব আবার হাতে,
খোঁপায় জড়াব কিংশুক-কলি, কাজল চোখের পাতে;
গলায় কি আজ পরিতে হইবে পদ্মা-রাগের মালা,
কানাড়া ছন্দে বাঁধিব কি বেণী কপালে সিঁদুর জ্বালা?
কাল সে আসিবে, মিছাই ছিঁড়িছি আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারাল উষার দেশ।

ওই বালুচরে আসিবে সে কাল, তার রাঙা মুখে ভরি,
অফুট উষার সোনার কমল আসিবে সোহাগে ধরি।
সে আসিবে কাল, গলায় পরিয়া কুসুম ফুলের হার,
দুখানি নূপুর মুখর হইবে চরণে জড়ায়ে তার।

মাথায় বাঁধিবে দুবালির লতা কচি সীমপাতা কানে,
বেণুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর করিবে গানে।
কাল সে আসিবে, রাই-সরিষার হলদি কোটার শাড়ি,
মটর কনেরে সাথে করে যেন খুলে দেখ নাড়ি নাড়ি।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, ধারে তার এই নদী,
তারি কূলে মোর ভাঙা কুঁড়ে ঘর, বহু দূরে নয় যদি ;
তবু কি তাহার সময় হইবে হেথায় চরণ ধরি,
মোর কুঁড়ে ঘর দিয়ে যাবে হায়, মণিমানিকেতে ভরি!
সে কি ওই চরে দাঁড়ায়ে দেখিবে বরষার তরুগুলি,
শীতের তাপসী কারে বা স্মরিছে আভরণ গার খুলি?
হয়তো দেখিবে, হয় দেখিবে না, কাল সে আসিবে চরে,
এপারে আমার ভাঙা ঘরখানি, আমি থাকি সেই ঘরে।

কাল সে আসিয়াছিল

কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে,
এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে করে।
কাশের পাতায় আঁচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়,
দুটি রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের ঘায়।
সারা গাও বেয়ে ঘামে ঝরিতেছে, অলসে অবশ তনু,
আমার দুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া, দেখিয়া অবাক হনু।

দেখিলাম তারে—যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি,
এই বালুচর মাথা কুটে কুটে ফুকারিয়া যারে ডাকি।
দেখিলাম তারে—যার লাগি এই উদাস ঝাউ-এর বন,
বরষ বরষ মোর গলা ধরি করিয়াছে ক্রন্দন :
দেখিলাম তারে তবু কেন হায় বলিতে নারিনু ডাকি,
কোন অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা আঁকি?
—বলিতে নারিনু, ওগো পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই,
আগুন জ্বেলেছ যেই ঘন-বনে সেকি পুড়ে হলো ছাই!
এলে কি দেখিতে—দূর হতে যারে হেনেছিলে বিষ-বাণ,
সে বন-বিহগী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান!

বলিতে নারিনু—নিঠুর পথিক, কেন এলে মিছেমিছি,
অলস চরণ অবশ দেহটি, সারা গায়ে ঘাম, ছি ছি!
এতখানি পথ হাঁটিয়া এসেছে কত না কষ্ট সহি,
তারি কাছে মোর দুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি?

নয়নের জল মুছিয়া ফেলিনু, মুখে মাখিলাম হাসি,
কহিলাম, বুঝি পুবের পুরুষ সাঁঝেতে উদিল আসি!
আঁচলে তাহারে বাতাস করিনু চরণ দুখানি ধুয়ে,
মাথার কেশেতে মুছাইয়া দিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে।
কহিলাম, বড়ো ভাগ্য আমার, আজিকার দিনখানি,
এমনি করিয়া রাখা যায় নাকি দুই হাতে যদি টানি!

রবির চলার রথ,
আজিকার তরে ভুলিতে পারে না অস্ত-পারের পথ?
কৌটায় ভরে সিঁদুর ত রাখি, আজিকার দিন হায়,
এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভরে কি রাখা না যায়।
এই দিনটিরে মাথার কেশেতে বেঁধে রাখা যায় নাকি!
মিছেমিছি কত বকিয়া গেলাম ছাইপাঁশ থাকি থাকি।
শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি,
সেই রাঙা মুখে—যে মুখেরে আমি এত করে ভালোবাসি!

মুখেতে মাখিল হাসি,
সোনাদেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুল-বাসী!
কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুঁড়ে ঘরে—
তার পাশে চলে ছোট্ট নদীটি দুইখানি তীর ধরে।
—সেই দুই তীরে রবি-শস্যেতে দিগন্ত গেছে ভরি—
রাইসরিষার জড়াজড়ি করে ফুলের আঁচল ধরি।
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা,
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল আঁকিয়া পায়ের রেখা।
কাল এসেছিল, চখা আর চখি এ ওরে আদর করি,
পাখা নেড়েছিল, তারি ঢেউ লাগি নদী উঠেছিল নড়ি।
—তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে—
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালকের তরে।

কালকের দিন, মেরু-কুহেলির অনন্ত আঁধিয়ারে
শুধু একখানা আলোক-কমল ফুটেছিল এক ধারে।
মহা-সাগরের দিগন্ত-জোড়া ফেন-লহরির পরে,
প্রদীপ-তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ ব্যথার ঝড়ে;
কালকে তাহারে পেয়েছিনু আমি, হায় হায় কত-কাল,
যারে ভাবি এই শূনো বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বাল;
সেই তারে হায়, দেখিয়া নারিনু খুলিয়া দেখাতে আমি,
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন-যামী;
যে আগুনে আমি জ্বলিয়া মরেছি সে দারুদাহন আনি,
কোন প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তনুতে হানি।

শুধু কহিলাম,—পরান-বন্ধু! তুমি এলে মোর ঘরে,
আমি ত জানিনে কী করে যে আজ তোমারে আদর করে'
বুকে যে তোমারে রাখিব বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে;
নয়নে রাখিব! হায়রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে!
কপালে রাখিব! এ ধরার গাঁয়ে আমার কপাল পোড়া;
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কভু নারে লাগে জোড়া।
সে কেবল শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চাহিল আমার পানে;
ও যেন আরেক দেশের মানুষ, বোঝে না ইহার মানে।

সামনে বসায়ে দেখিলাম তারে দেখিলাম সেই মুখ—
ভাবিলাম ওই সুমেরু হইতে কী করে যে আসে দুখ।
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উঁচু বেলা,
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে আঁকিয়া খেলা।
বালুচর হতে বিদায় মাগিল নতুন বকের সারি,
পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালির ফুল নাড়ি।

সে মোরে কহিল, দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি?
—যার রাঙা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠে হাসি।
সে মোরে কহিল, একটি কথায় ভাঙিল স্বপন মোর,
ভাঙিল তাহার সোনার চূড়াটি, ভাঙিল সকল দোর।

সে মোরে কহিল, শোন তাপসিনী! আজকের মতো তবে,
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুশি হবে যবে।

হাসিয়াই তারে কহিলাম, সখা! বিদায় নমস্কার।
অভাগিনী আমি রুধিতে নারিনু নয়নজলের ধার।
খানিক যাইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমারে, শোনো,
চোখে কেন জল, কিছু কয়ে তোমা ব্যথা কি দিয়েছি কোনো?

আমি কহিলাম, সুন্দর সখা আমার নয়ন-ধার—
পাইয়াও যে গো পাইনে তোমারে—ভাষা এই বেদনার।
‘আমি কি নিঠুর?’ সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাম, নয় ;
ফুলেরো আঘাত গায়ে লাগে যার, কে তারে নিঠুর কয়?
গলায় যাহারে মালা দেই নাকো হয়তো মালার ভারে,
তাহার কোমল ফুলের অঙ্গে কোনো ব্যথা দিতে পারে!

ছুঁই না যাহারে ভয়ে,
ও দেহ-তরুর অস্ফুট কুসুম যদি পড়ে যায় ক্ষয়ে।
সে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বালা এ কথা ভাবিব যবে,
রোজ-কেয়ামত ভেঙে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে।
তবে কেন কাঁদ? হায় তাপসিনী! জীবনের ভোরখানি
কার হেলা পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি।
আমি কহিলাম, সোনার বন্ধু। এ মোর ললাট-লেখা,
কেউ পারিবে না মুছাইয়া দিতে ইহার গভীর রেখা।

মাথার পসরাখানি,
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সমুখে চরণ টানি।
এ জীবনে কেউ দোসর হবে না, নিবে না করিয়া ভাগ,
এই বুক ভরি জমায়েছি যত তীর বিষের দাগ।

তবু বলি সখা! কেন কাঁদি আমি, তোমারে দেখিয়া মোর,
কেন বয়ে যায় শাঙনের ধারা ভাঙিয়া নয়নদোর।
আমি কাঁদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে,
বিধির গড়া ত সবই পাওয়া যায়, মানুষেরে নাহি মেলে।

আকাশ গড়েছে শ্যাম-ঘননীল দুখের নবীন মেঘে,
সন্ধ্যাসকাল প্রতিদিন যায় নব নব রূপ মেখে ;
যত দূরে যাই তত দূরে পাই কেউ নাহি করে মানা,
কেউ নাহি পারে কাড়িয়া লইতে মাথার আকাশখানা।

—বিধাতা গড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুসুম-কলি,
কোলে কোলে তার পাখি গাহে গান, গুঞ্জরে মধু অলি।
বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়া পাখায় জড়ায়ে প্রাণ,
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুলকলিদের দান।

তটিনী চলেছে গাহি—
তার জলে আজ সম-অধিকার, কারো কোনো বাধা নাহি।
শুধু মানুষেরে পায় না মানুষ, নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ ভবে, মানুষ হল না কার!
কেন তুমি সখা! মানুষ হইলে, অতটুকু দেহ ভরি,
বিশ্ব জোড়া এ রূপ-পিপাসারে কেন রাখিয়াছ ধরি।
আমি কাঁদি সখা! কেন তুমি নাহি আকাশের মতো হলে,
যেখানে যেতাম তোমারে পেতাম, দেখিতাম নানা ছলে।

আকাশের তলে ঘর,
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।
তুমি কেন সখা! কানন হলে না, ফুলের সোহাগ পরি,
রঙিন তোমার দেহ-দীপখানি পুলকে উঠিত ভরি।
বাউল বাতাসে ভাসিয়া যেতাম তোমার ফুলের বনে,
অনন্ত-তৃষা মিটায়ে নিতাম অনন্ত-পাওয়া সনে।

কেন তুমি সখা! মানুষ হইলে! সীমারে বরণ করি
অসীম ক্ষুধারে সীমার বেড়ার বাহিরে রেখেছ ধরি।
তুমি কেন সখা! এমন হলে না—যত দূরে যাইতাম,
আকাশের মতো যত দূরে চাহি তোমারেই পাইতাম।
আমি অনন্ত, আমি যে অসীম, অনন্ত মোর ক্ষুধা—
বিপুল এ দেশে ভাসিতেছ তুমি একটু সীমার সুধা।

হায় রে মানুষ হায়!
কেমন করিয়া পাব তারে, যারে ধরা-ছোঁয়া নাহি যায়;
আমি কাঁদি কেন সুন্দর সখা! তোমারে বলিব খুলি
এই বেদনায়, কেন তুমি এলে মানুষ হইয়া ভুলি?
যে মানুষ এই ধরারে দেখিছে নীতির চশমা পরি,
যার যাহা পায় তাই লয় সে যে পালায় ওজন করি।
জগৎ জুড়িয়া পাতিয়াছে যারা মনুসংহিতা বই—
আমি কাঁদি সখা! আর কিছু নও তুমি সে মানুষ বই।

জগতের মজা ভারি—
চোখ বেঁধে যারা ধরারে দেখিল তাহাদেরি নাম জারি।
বাহিরে হাসিছে নীতির জগৎ, তাহার আড়ালে বসি,
কাঁদে উভরায় উলঙ্গ নর পরি শাসনের রসি।
সে বলে যে আমি না-ভালো-মন্দ, আমি নর-নারায়ণ,
মহাশক্তিরে বাঁধিয়া রেখেছে সংস্কার বন্ধন।
আমি কাঁদি সখা! আমার মাঝারে আছে সে আমার আমি,
মোর সুখে দুখে মন্দ-ভালোয় সুনাম-কুনামে নামী;
এ-জগতে কেউ চাহিল না তারে; এ মোর পসরাখানি,
যারে দিতে যাই সেই ফিরে চায় হেলায় নয়ন টানি।

জগতের হাটে তাই—
সে মোর আমারে খণ্ড করিয়া দোকানে বিকায়ে যাই।
কেউ হাসি চায়, কেউ ভালোবাসা, কেউ চায় মিঠে-কথা,
কেউ নিতে চায় নয়নের জল, কেউ চায় এর ব্যথা।
শস্যের খেতে একেলা কৃষাণ বীজ ছড়াইয়া যাই,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য ছড়ানু, কোনো কিছু মনে নাই।
আমি কাঁদি সখা! হাটে-বেচা সেই খণ্ড আমারে লয়ে,
যারে ভালোবাসি—তাহার পূজায় কেমনে আনিব বয়ে।
হায় হায় সখা! তুমি কেন হলে হাটের দোকানদার—
খণ্ড করিয়া চাহ যারে তুমি পূর্ণ চাহ না তার?
সব কথা মোর শুনে সে কেবল কহিল একটু হাসি—
মোর যত কথা কব একদিন, আজকের মতো আসি।

পায়ে পায়ে পায়ে যতদূর গেল, নিমেষে রহিনু চেয়ে;
সন্ধ্যাতিমিরে কলস ডুবাল সাঁঝের রঙিন মেয়ে।
শূন্য চরের মাতাল বাতাস রাতের কুহেলি কেশ,
নাড়িয়া নাড়িয়া হয়রান হয়ে ফিরিল উষার দেশ।
কতদিন গেল, কত রাত এল ঋতুর বসন পরি,
চলে কাল-নটী বরনে বরনে বরষের পথ ধরি।
আজো বসে আছি এই বালুচরে, দুহাত বাড়িয়ে ডাকি,
কাল যে আসিল এই বালুচরে, আর সে আসিবে নাকি?

দুরাশা

শূন্য নদীর কূলে,
আমার বেদনা দুটি তট বেড়ি কাঁদিতেছে কুলে ফুলে।
উতল বাতাস পাখা নাড়িতেছে ব্যাকুল বেণুর শাখে।
কাশবন আজি গড়াগড়ি যায় সারা গায়ে ধূলি মাখে।
গগন-রেখার চক্র ধরিয়া বৃথা কাঁদে দূর বন,
সেই নির্মম কভু পরিল না সবুজের বন্ধন।

মিছে ঘুরে মরে চরের বিহগ শূন্যে বাঁধিয়া ডানা,
সে দূর আজিও পাখার বাসরে আনেনি আকাশখানা।
বৃথা কেঁদে মরে মাটির ধরায় সবুজের আল্‌পনা,
কোমল বাহুর বাঁধন তাহার আজো কেউ পরিল না।

আর একদিন আসিও বন্ধু

আর একদিন আসিও বন্ধু—আসিও এ বালুচরে;
বাহুতে বাঁধিয়া বিজলির লতা রাঙা মুখে চাঁদ ভরে।
তটিনী বাজাবে পদ-কিঙ্কিণী পাখিরা দোলাবে ছায়া,
সাদা মেঘ তব সোনার অঙ্গে মাখাবে মোমের মায়া।

আসিও সজনী, এই বালুচরে, আঁকা বাঁকা পথখানি,
এধারে ওপারে ধানখেত তারে লয়ে করে টানাটানি
কখনো সে গেছে ওধারে বাঁকিয়া কখনো এধারে আসি,
এরে ওরে লয়ে জড়াজড়ি করে ছড়ায় ধুলার হাসি।
এই পথ দিয়ে আসিও সজনী, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়,
দিগন্ত-জোড়া ধানের খেতের গন্ধ মাখিয়া গায়;
—চরের বাতাস বাতাস করিয়া শীতল করিছে যারে,
সেই পথে তুমি চরণ ফেলিয়া আসিও এ নদী পারে।
আর একদিন আসিও সজনী! এ মোর কামনাখানি,
মূক বালুচরে আখর এঁকেছি নখরে নখর হানি।
লিখিয়াছি তাহা পাখির পাখায় মোর নিঃশ্বাস লয়ে,
আর লিখিয়াছি দূর গগনের কনক মেঘের ছায়ে।
সেই সব তুমি পড়িয়া পড়িয়া অলস অবশ কায়,
এইখানে এসে থামিও বন্ধু, মোর বেণুবন ছায়।
এই বেণুবন মোর সাথে সাথে কাঁদিয়াছে বহু রাতি,
পাতায় পাতায় জড়াজড়ি করি উতল পবনে মাতি।

এইখানে সখি! সাক্ষ্য হইয়া রাতের প্রহরগুলি,
কত যে গভীর বেদনা আমার তোমারে বলিবে খুলি।
রাত-জাগা পাখি কহিবে তোমারে, আমার বে-ঘুম রাতি,
কাটিতে কাটিতে কী করে নিবেছে একে একে সব বাতি।
সেইখানে তুমি বসিও সজনী! মনে না রাখিও ডর,
সেদিন কাহারো কোনো অভিযোগ হানিবে না কারো পর।
সেদিন আমার যত কথা সখি! এই মূক মাটি তলে,
মোর সাথে সাথে ঘুমায়ে রহিবে মহা-মৃত্যুর কোলে।
এই নদীতটে বরষ বরষ ফুলের মহোৎসবে;
আসিবে যাহারা তাহাদের মাঝে মোর নাম নাহি রবে।

সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে, অভাগা গাঁয়ের কবি,
জীবনের কোন কনক বেলায় দেখেছিল কার ছবি।
ফুলের মালায় কে লিখিল তারে গোরের নিমন্ত্রণ,
কে দিল তাহারে ধূপের ধোঁয়ায় নিদারুণ হুতাশন।

সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে কথা এই অভাগার,
জানিবে না কেউ কত বড়ো আশা জীবনে আছিল তার।
ধরণীর বুকে প্রদীপ রাখি সে, আকাশেরে ডাক দিত,
মাটির কলসে জল ভরে সে যে তটিনীরে বুকে নিত।
এত বড়ো আশা কী করে ভাঙিল, কী করে জীবন ভোর,
রঙ-কুহেলির সোনার স্বপন ভাঙিল সিঁধেল চোর।
এসব সেদিন স্মরিবে না কেহ, দুঃখ নাহিক তায়,
যে গেল তাহারে ফিরায়ে আনিতে পিছু ডাক নাহি হায়।
যে দুখে আমার জীবন দহিল সে দুখের স্মৃতি রাখি,
সবার মাঝারে রহিব যে বেচে, এর চেয়ে নাই ফাঁকি।
তুমিও আমারে ভেবো না সেদিন, আমার দুঃখভার :
এতটুকু ব্যথা নাহি আনে যেন কোনোদিন মনে কার;
এ মোর জীবনে তোমার হাতের পেয়েছিনু অবহেলা,
এই গৌরব রহিল আমার ভরিতে জীবনভেলা।
তুমি দিয়াছিলে আমারে আঘাত, তারি মহা মহিমায়
সবার আঘাত দলিয়া এসেছি এ মোর চরণ ঘায়।
তোমারে আমার লেগেছিল ভালো, আর সব ভালো তাই
আমার জীবনে এতটুকু দাগ কেহ কভু আঁকে নাই।
তোমারে নিকটে পেয়েছিনু ব্যথা তারি গৌরবভরে,
আর সব ব্যথা খড়কুটা সব ছিঁড়িয়াছি নখে ধরে।

তুমি দিয়েছিলে ক্ষুধা,
অবহেলে তাই ছাড়িয়া এসেছি জগতের যত সুধা
এ জীবনে মোর এই গৌরব তোমারে যে পাই নাই,
আর কারো কাছে না-পাওয়ার ব্যথা সহিতে হয়নি তাই।
তোমার নিকট কণিকা না পেয়ে আমি হয়েছিনু ধনী—
আমার কুটিরে ছড়াছড়ি যেত রতন মানিক মণি।

তাই সেই শুভ ক্ষণে—
মোর পরে তব যত অন্যায় আনিও না কভু মনে।
আমারে যে ব্যথা দিয়েছিলে তুমি, তাতে নাহি মোর দুখ,
তুমি সুখে ছিলে, মোর সাথে রবে এই স্মরণের সুখ।

আর একদিন আসিও সজনী। মোর কণ্ঠের ডাক
যতদিন তুমি না আসিবে যেন নাহি হয় নির্বাক।
এ মোর কামনা পাখি হয়ে যেন এই বালুচরে ফেরে,
যেন বাজ হয়ে গগনে গগনে মেঘের বসন ছেঁড়ে।
এই কথা আমি ভরে রেখে যাই খর-তটিনীর জলে,
যেন দুই কূল ভাঙিয়া সে চলে আপনার কল্লোলে।
আর একদিন আসিও সজনী। এ আমার অভিশাপ
যত দিন যাবে পলে পলে এর বাড়িবে ভীষণ তাপ।
এই বাসনার ইন্ধন জ্বালি সাজালেম যেই হোম
কাল-নটেশের চরণের তালে জ্বলে যেন নির্মম।
যেন তারি দাহ সপ্ত আকাশ ভেদিয়া উপরে ধায়,
চন্দ্র-সূর্য মুরছিয়া পড়ে তারি নিশ্বাস ঘায়।
যেন সে বহ্নি শত ফণা মেলি করে বিষ উদ্‌গার,
তারি দাহ হতে তুমি যেন কভু নাহি পাও উদ্ধার।
যতদিন তুমি এই বালুচরে নাহি আস পুন ফিরে,
আজি এই কথা লিখে রেখে যাই বালুকার বুক চিরে।

কৃষাণী দুই মেয়ে

কৃষাণী দুই মেয়ে
পথের কোণে দাঁড়িয়ে হাসে আমার পানে চেয়ে।
ওরা যেন হাসি-খুশির দুইটি রাঙা বোন,
হাসি-খুশির বেসাত ওরা করছে সারাখন।
ঝাকড়া মাথার কোঁকড়া চুলে, লেগেছে খড়কুটো,
তাহার নীচে মুখ দুখানি যেন তরমুজফালি দুটো।
সেই মুখেতে কে দুখানি তরমুজেরি ফালি,
বেঁধে রাঙা ঠোঁটের শোভা দেখছে যেন খালি।
একটি মেয়ে লাজুক বড়ো, মুখর আরেক জন,
লজ্জাবতীর লতা যেন জড়িয়ে গোলাপ বন।

একটি হাসে, আর সে হাসি লুকায় আঁচল কোণে,
রাঙা মুখের খুশি মিলায় রাঙা শাড়ির সনে।

পউষ-রবির হাসির মতো আরেক জনের হাসি,
কুয়াশাহীন আকাশ ভরে টুকরো-মেঘে ভাসি।
চাষীদের ওই দুইটি মেয়ে ঈদের দুটি চাঁদ,
যেই দেখেছি, পেরিয়ে গেল নয়নপুরীর ফাঁদ!

রাখালের রাজগী

রাখালের রাজা! আমাদের ফেলি কোথা গেলে ভাই চলে,
বুক হতে খুলি সোনা লতাগুলি কেন গেলে পায়ে দলে?
জানিতেই যদি পথের কুসুম পথেই হইবে বাসি,
কেন তারে ভাই! গলে পরেছিলে এতখানি ভালোবাসি?
আমাদের দিন কেটে যাবে যদি গলেতে কাজের ফাঁসি
কেন শিখাইলে ধেনু চরাইতে বাজায়ে বাঁশের বাঁশি?
খেলিবার মাঠ লাঙল বাজায়ে চষিতেই যদি হবে,
গাঁয়ের রাখাল ডাকিয়া সেথায় রাজা হলে কেন তবে?

তুমি চলে গেছ, শুধু কি আমরা তোমারি কাঙাল ভাই!
হারায়েছি গান, গোচারণ মাঠ, বাঁশের বাঁশরি তাই।
সোজাসুজি আজ উধাও চলিতে কোথা সে উধাও মাঠ,
গোখুর ধুলোর চাদোয়া-টাঙানো কোথা সে গাঁয়ের বাট?
চরণ ফেলিতে চরণ চলে না শস্য-খেতের মানা,
খেলিবার মাঠে বড় জমকালো মিলেছে পাটের থানা!
গেঁয়ো শাখী আজ লুটায়ে পড়িছে কাঁচা পাকা ফল-ভারে,
তলে তলে তার মাঠের রাখাল হাট মিলাইতে নারে।
চষা মাঠে আজ লাঙল চলিতে জাগে না ভাটির গান
সারা দিন খেটে অন্ন কুড়াই, তবু তাতে অকুলান।
ধানের গোলার গর্বেতে আজি ভরে না চাষীর বুক,
টিনের ঘরের আট-চালা বেঁধে রোদে জ্বলে পায় সুখ।
বাছের নায়েতে ছই দিয়ে চাষী পাটের বেপার করে,
দাবাড়ের গরু হালের খেতে যে জোয়াল বহিয়া মরে

হেমন্ত নদ ঢেউ খেলেনাক সারীর গানের সুরে,
গরু-দৌড়ের মাঠখানি চাষী লাঙলেতে দেছে ফুঁড়ে।

মনে পড়ে ঘর ছোনের ছাউনি, বেড়িয়া চালের বাতা,
কৃষাণবধূর বুকখানি যেন লাউ-এর লতায় পাতা।
তারি পাশে পাশে প্রতি সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ ধরি
কুমারী মেয়েরা আশিস মাগিত গ্রাম-দেবতারে স্মরি।

আজকে সেখানে জ্বলে না প্রদীপ, বাজে না মাঠের গান,
ঘুমলী রাতের প্রহর গনিয়া জাগে না বিরহী প্রাণ।
শূন্যে বাড়িগুলো রয়েছে দাঁড়ায়ে, ফাটলে ফাটলে তার,
বুনো লতাগুলো জড়ায়ে জড়ায়ে গেঁথেছে বিরহ-হার।

উকুন যাহার গায়ে মারা যায়—খন খন করে তাজা,
এমন গরুরে পালিয়া কৃষাণ নিজেরে বলে না রাজা!
ধানের গোলার গর্ব ভুলেছে, ভুলেছে গায়ের বল,
চক্ষু বুজিয়া খুঁজিছে কোথায় টাকা বানানোর কল।
সারাদিন ভরি শুধু কাজ কাজ আরও চাই আরও—আরও—
ক্ষুধিত মানুষ ছুটিছে উধাও, তৃষ্ণা মেটে না কারও।
পেটে নাই ভাত, মুখে নাই হাসি, রোগে হাড়খানা সার,
প্রেত-পুরী যেন নামিয়া এসেছে বাহিয়া নরক-দ্বার!
হাজার কৃষাণ কাঁদিছে অঝোরে কোথা তুমি মহারাজ?
ব্রজের আকাশ ফাড়িয়া ফাড়িয়া হাঁকিছে বিরহ-বাজ।
আমরা তোমারে রাজা করেছিনু পাতার মুকুট গড়ে,
ছিঁড়ে ফেলে তাহা মণির মুকুট পরিলে কেমন করে?
বাঁশরি বাজায়ে শাসন করেছ মানুষ-পশুর দল,
সুর শুনে তার উজান বহিত কালো যমুনার জল।
কোন প্রাণে সেই বাঁশের বাঁশরি ভেঙে এলি গেঁয়ো বাটে?
কার লোভে তুই রাজা হলি ভাই! মথুরার রাজপাটে?
বাঁশরি শাসন হেলায় সয়েছি, বুনো ফলে দিছি কর,
অসির শাসন কী দিয়ে সহিব, বেচিয়াছি বাড়িঘর;
হালের গরুরে নিলামে দিয়েও মিটাতে পারিনি ভুখ,
আধখানা ফলে পেট ভরে যেত—ভেবে ভেবে হয় দুখ:—

এত পেয়ে তোর সাধ মেটে নাকো, দুনিয়া জুড়িয়া ক্ষুধা,
আমরা রাখাল মাঠের কাঙাল যোগাইব তারি সুধা!

শোন রে কানাই! পষ্ট কহিছি, সহিব না মোরা আর,
সীমার বাহিরে সীমা আছে যদি, ধৈর্যেরো আছে বার।
ভাবিয়াছ ওই অসির শাসনে মোরা হয়ে জড়সড়,
নিজের ক্ষুধার অন্ন আনিয়া চরণে করিব জড়?

বাঁশির শাসন মেনেছি বলিয়া অসিও মানিতে হবে?
গুরু দেয়া-ডাকে কাজরী গেয়েছি, ঝড়েও গাহিব তবে?
বাঁশির শাসন বুকে যেয়ে লাগে, নত হয়ে আসে শির,
অসির শাসনে মরদেরো মাঝে জেগে ওঠে শত বীর।
ভাবিয়াছ, মোরা গাঁয়ের রাখাল, নাই কোনো হাতিয়ার,
যে লাঙল পারে মাটিরে ফাড়িতে, ভাঙিতেও পারে ঘাড়।
ঝড়ের সঙ্গে লড়িয়াছি মোরা, বাদলের সাথে যুঝি,
বর্ষার সাথে মিতালি পাতায়ে সোনা ধান করি পুঁজি!

তবুও সেখানে প্রদীপ জ্বালাই ঘন আঁধারের কোলে,
আঁকড়িয়া আছি পল্লীর মাটি কোন ক্ষমতার বলে!
জনমিয়া যারা দুখের নদীতে শিখিয়াছে দিতে পাড়ি,
অসির শাসনও তরিবে তাহারা যাক না দুদিন চারি।
পষ্ট করিয়া কহিছি কানাই, এখনো সময় আছে,
গাঁয়ে ফিরে চলো, নতুবা তোমায় কাঁদিতে হইবে পাছে
জনম-দুখিনী পল্লী-যশোদা আশায় রয়েছে বাঁচি,
পাতায় পাতায় লতায় লতায় লতিয়ে স্নেহের সাজি!
হিয়াখানি তার হানা-বাড়ি সম ফাটিলে ফাটিলে কাঁদি
বক্ষে লয়েছে তোমারি বিরহ বনের লতায় বাঁধি।

আঁধা পুকুরের পচা কালো জলে মরিছে কমল-রাধা,
কৃষাণবধূরা সিনান করিতে শুনে যায় তারি কাঁদা।
বেণুবনে তুমি কবে বেঁধেছিলে তোমার বাঁশের বাঁশি,
দখিনা বাতাস আজিও তাহারে বাজাইয়া যায় আসি!

কোমল লতায় দোলনা বাঁধিয়া পাখীরা ডাকিছে সুরে,
আর কত কাল ভুলে রবি ভাই, পাষাণ মথুরা-পুরে?

আমরা ত ভাই! ভেবে পাইনাক তোরি বা কেমন রীত,
একলা বসিয়া কেতাব লিখিস ভুলিয়া মাঠের গীত।
পুঁথিগুলো সব পোড়াইয়া ফ্যাল, দেখে গাও করে জ্বালা,
কেমনে কাটাস সারাদিন তুই লইয়া ইহার পালা?
ওরাই তো তোরে যাদু করিয়াছে, মোরা যদি হইতাম,
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বানাইয়া ঘুড়ি আকাশে উড়াইতাম!
রাজধানী ঘেরে পরদেশ তোর—ইট-কাঠ দিয়ে ঘেরা,
ইট-কাঠ তাই আঁটিঘাট বেঁধে মনেও কি দিলি বেড়া?

এত ডাক ডাকি শুনে না শুনিস, এমনি কঠিন হিয়া—
আমরা রাখাল ভাবিয়া না পাই—গলাইব কীবা দিয়া?
একেলা আমরা মাঠে মাঠে ফিরি, পথে পথে কেঁদে মরি,
আমাদের গান শোনে নারে কেউ, লয় নাকো হাত ধরি।

চলো গাঁয়ে যাই, আঁকাবাঁকা পথ ধূলার দোলায় দোলে,
দুধারের খেত কাড়াকাড়ি করে তাহারে লইতে কোলে।
কদম্ব-রেণু শিহরিয়া উঠে নতুন পাটল মেখে,
তমালের বনে বিরহী রাধার বাধা-দেয়া যায় ডেকে।

যাব আমি তোমার দেশে

পল্লী-দুলাল, যাব আমি—যাব আমি তোমার দেশে,
আকাশ যাহার বনের শিষে দিক-হারা মাঠ চরণ ঘেঁষে।
দূরদেশীয়া মেঘ-কনেরা মাথায় লয়ে জলের ঝারি,
দাঁড়ায় যাহার কোলটি ঘেঁষে বিজলি-পেড়ে আঁচল নাড়ি।
বেতস কেয়ার মাথায় যেথায় ডাহুক ডাকে বনের ছায়ায়,
পল্লী-দুলাল ভাই গো আমার, যাব আমি যাব সেথায়।

তোমার দেশে যাব আমি, দীঘল বাঁকা পন্থখানি,
ধান কাউনের খেতের ভেতর সরু সূতোর আঁচল টানি;

গিয়াছে সে হাবা মেয়ের এলোমাথার সিঁথির মতো
কোথাও সিধে, কোথায় বাঁকা, গরুর পায়ের রেখায় ক্ষত ;—
গাজনতলির মাঠ পেরিয়ে, শিমুলতলীর বনের বাঁয়ে,
কোথাও গায়ে রোদ মাখিয়া, ঘুম-ঘুমায়ে গাছের ছায়ে;
তাহার পরে মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়ে কদম-কলি,
কোথাও মেলে বনের লতা গ্রাম্য মেয়ে যায় যে চলি ;
সে পথ দিয়ে যাব আমি পল্লী-দুলাল তোমার দেশে,
নাম-না-জানা ফুলের সুবাস বাতাসেতে আসবে ভেসে।

তোমার দেশে যাব আমি, পাড়ার যত দস্যি ছেলে,
তাদের সাথে দল বাঁধিয়া হেথায় সেথায় ফিরব খেলে।
থল-দীঘিতে সাঁতার কেটে আনব তুলে রক্ত-কমল,
শাপলা লতায় জড়িয়ে চরণ ঢেউ-য়ের সাথে খাব যে দোল।
হিজল-ঝরা জলের সাথে গায়ের বরন রঙিন হবে,
দীঘির জলে খেলবে লহর মোদের লীলাকালোসবে।

তোমার দেশে যাব আমি পল্লী-দুলাল ভাইগো সোনার,
সেথায় পথে ফেলতে চরণ লাগবে পরশ এই মাটি-মার!
ডাকব সেথা পাখির ডাকে, ভাব করিব শাখীর সনে,
অজান ফুলের রূপ দেখিয়া মানব তারে বিয়ের কনে ;
চলতে পথে ময়না কাঁটায় উত্তরীয় জড়িয়ে যাবে,
অচেল মাটির হোঁচট লেগে আঁচল হতে ফুল ছড়াবে।
পল্লী-দুলাল, যাব আমি—যাব আমি তোমার দেশে,
তোমার কাঁধে হাত রাখিয়া ফিরব মোরা উদাস বেশে।
বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখব মোরা সাঁঝ-বাগানে,
ফুল ফুটেছে হাজার রঙের মেঘ-তুলিকার নিখুঁত টানে;
গাছের শাখা দুলিয়ে আমি পাড়ব সে ফুল মনের আশে,
উত্তরীয় ছড়িয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থেকো বনের পাশে।

যে ঘাটেতে ভরবে কলস গাঁয়ের বিভোল পল্লীবালা,
সেই ঘাটেরি এক ধারেতে আসব রেখে ফুলের মালা ;

দীঘির জলে ঘট বুড়াতে পথে পাওয়া মালাখানি,
কুড়িয়ে নিয়ে ভাববে ইহা রাখিয়া গেছে কেউ না জানি।
চেনে-না তার হাতের মালা হয়তোবা সে পরবে গলে,
আমরা দু'জন থাকব বসে ঢেউ-দোলা সেই দীঘির কোলে।
চার পাশেতে বনের সারি এলিয়ে শাখার কুন্তল-ভার,
দীঘির জলে ঢেউ গণিবে ফুল শুঁকিবে পদ্ম-পাতার।
বনের মাঝে ডাকবে ডাহুক, ফিরবে ঘুঘু আপন বাসে,
দিনের পিদিম ঢুলবে ঘুমে রাত-জাগা কোন ফুলের বাসে।
চার ধারেতে বন জুড়িয়া রাতের আঁধার বাঁধবে বেড়া,
সেই কুহেলির কালো কারায় দীঘির জলও পড়বে ঘেরা।
সেই আঁধারে পাখায় ধরে চামচিকারা উচ্চে উঠি,
দিকে দিকে দিগন্তেরে ছড়িয়ে দেবে মুঠি মুঠি।
তখন সেথা থাকবে না কেউ, সুদূর বনের গহন কোণে,
কানাকুয়া ডাকবে শুধু পহরের পর পহর গনে।
সেই নিরালার বুকটি চিরে পল্লীদুলাল আমরা দুজন,
পল্লীমায়ের রূপটি যে কী, করব মোরা তার অন্বেষণ।

চৌধুরীদের রথ

চৌধুরীদের রথ

ডান ধারে তার ধুলায় ধূসর তালমা হাটের পথ।
চামচিকে আর আরসুলারা নির্ভাবনায় বসি,
করছে নানান কল-কোলাহল রথের মাঝে পশি।
বাদুড় সেথা ঝুলছে সুখে, বাহির জগৎখানি,
অনেক দিনই ত্যাগ করেছে তাদের জানাজানি।
গরুর বীরের মাথায় বসি পাকুড় গাছের চারা,
মেলছে শিকড়, তবু ঠাকুর দেয়নি কোনো সাড়া।
কাঠের ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙেছে, খসছে রথের ছাদ,
আজো তবু কেউ করেনি ইহার প্রতিবাদ।
রাস্তা দিয়ে নানান রকম লোকের চলাচল;
নানান রকম আলাপ বিলাপ, নানান কোলাহল।

কেউ বা চাষী, কেউ বা ধনী, পরদেশী, কেউ দেশী,
ভাবে তারা সবার চেয়ে কাজের কথাই বেশি।
কেউ বা ভাবে, মোকর্দমায় হারিয়ে দিয়ে কার
বসত-বাড়ি করবে নিলাম বাঁশ-গাড়িতে তার।
কেউ বা ভাবে, কী কৌশলে মেলি কথার জাল,
এক আনিতে আনবে টেনে ছয়পয়সার মাল।
যতই কেন ব্যস্ত থাকুক, যতই কাজের তাড়া;
হেথায় এলে সব ভুলে চায় রথের পানে তারা।
চাকা-ভাঙা আর বয়স-মলিন চৌধুরীদের রথ,
তাদের পানে করুণ চেয়ে শুধায় যেন পথ;—
শুধায় যেন, সেই অতীতের চৌধুরীদের কে,
ছুতোর ডেকে রঙিন এ-রথ গড়ল পুলকে!
আসল গাঁয়ের বৃদ্ধ পোটো, রঙিন তুলির সনে,
রেখায় রেখায় বাঁধল সে কোন সোনার স্বপনে।
রথের চুড়ায় উড়ল ধ্বজা, গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে,
চলতে পথে থাকত খানিক রথের পানে চেয়ে।

তারপরে সে রথের দিনে হাজার লোকের মেলা,
দোকান-পসার, ভোজবাজি আর ভানুমতীর খেলা;
আসত গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সব, আনত ছেলে-মেয়ে,
রঙিন হাসির দুলত লহর রঙিন কাপড় ছেয়ে।
বুড়ো মাঝির স্কন্ধে উঠে ছোট্ট শিশু ছেলে;
এই রথেরি ঠাকুরটিরে দেখত আঁখি মেলে।
গাঁর বধূরা ভালের সিঁদুর মেলে পথের পরে
সরল বুকের আঁকত পূজা এই ঠাকুরের তরে।
আঁচল তাদের জড়িয়ে ধরে ছোট্ট শিশুর দল,
তালের পাতার বাজিয়ে বাঁশি করত কোলাহল।
দৌড়ের নাও ভাসত গাঙে, রঙিন নিশান লয়ে,
গলুই ভরি জ্বলত পিতল নব-রতন হয়ে।
তাহার গলে পরিয়ে দিত রঙিন সোলার-মালা,
এমনি মতো হাজার নায়ে গাঙটি হতো আলা।
সেই নায়েতে বাছ খেলাত গাঁয়ের যত চাষী;

বৈঠা পরে বৈঠা হাঁকি চলত তারা ভাসি।
তারি তালে গাইত তারা ভাটির সুরে গান,
শুনে নদী উথাল পাথাল, ঢেউ ভেঙে খান খান।
কৌতূহলী দাঁড়িয়ে তীরে হাজার নর-নারী,
হাতে তাদের দুলত মালা গলায় দিতে তারি,
যাহার তরী সব তরীরে পেরিয়ে যাবে আগে,
তারে তারা করবে বরণ মনের অনুরাগে।

সে-সব আজি কোথায় গেল, চৌধুরীদের রথ,
আজো যেন শুধায় সবে তাদের চলা-পথ।
চাকাগুলো ভেঙেছে তার উই ধরেছে কাঠে,
কোন অভিযোগ বক্ষে লয়ে সময় তাদের কাটে!
ছবিগুলো যাচ্ছে মুছে, ভাঙা কদম ডাল,
ত্যাগ করিয়া পালিয়ে গেছে নিঠুর বংশীয়াল।
তলায় বসে একলা রাধা কাঁপছে পুলকে,
জানতে আজো পায়নি তাহার বন্ধু নিল কে।
মাঠের পথে চলছে ধেনু বিরাম নাহি হায়,
রাখাল কবে ঠ্যাং ভেঙেছে, কেউ না ফিরে চায়।
দল বাঁধিয়া চলছে কোথাও গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে,
মৃদঙ্গ আর ঢোল বাজায়ে, বাঁশিতে গান গেয়ে।
হয়তো কোনো পরব গাঁয়ের করবে সমাপন,
হাজার বরষ আগেই তাহার করছে আয়োজন!
কারো কাঁধের ঢোল ভেঙেছে কাহারো একতারা,
দল-পতি যে নেইকো সাথে, টের পায়নি তারা।
এমনি কালের কঠোর ঘায়ে দিনের পর দিন,
এসব ছবির একখানিরও থাকবে নাকো চিন!
এর সাথে সেই গাঁয়ের পোটো,—তাহার কথাও সবে,
ভুলে যাবে অজানা কোন দিনের মহোৎসবে।
কোন সে অতীত আঁধার সাগর, তাহার পারে বসি,
এঁকেছিল সোনার স্বপন বরন ঘষি ঘষি।
হয়তো তারি গাঁয়ের যত নর-নারীর দল,
মনে তাহার ফুটিয়েছিল স্বপন শতদল ;

তারি একটি সোনার কলি আলোক-তরীর প্রায়,
সপ্ত সাগর পার হইয়া ভিড়ছে রথের গায়।
আজ হয়তো অনাদরেই অনেক অভিমানে,
চলছে ফিরে প্রদীপ-তরী সেই অতীতের পানে ;
সেখানে সেই বৃদ্ধ পোটো বনস্পতির প্রায়,
হাজার শাখা এলিয়ে বায়ে দুলছে নিরালায়
চাকভাঙা আর বয়সমলিন চৌধুরীদের রথ,
আজো যেন চক্ষু মুদে খুঁজছে তাদের পথ।
বনের লতায় গা ছেয়েছে, গাছের শাখা তারে,
জড়িয়ে ধরে এ সব কথা শুনছে বারে বারে।

রঙিলা নায়ের মাঝি

(৩)

উজান গাঙের নাইয়া।
কইবার নি পাররে নদী
গেছে কত দূর?
যে কূল ধইরা চলেরে নদী
সে কূল ভাইঙ্গা যায়
আবার আলসে ঘুমায়া পড়ে
সেই কূলেরি গায় ;
আমার ভাঙ্গা কূলে ভাসাই তরীরে
যদি পাই দেখা বন্ধুর ;
উজান গাঙের নাইয়া।

নদীর পানি শুনছি নাকি
সায়র পানে ধায়,
আমার চোখের পানি মিলব যায়া
কোন সে দরিয়ায় ;

সেই অজানা পারের লাইগা রে
আমার কান্দে ভাটির সুর ;
উজান গাঙের নাইয়া।

(৯)

ও আমার দরদী
আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।
এই ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না আর দূরের পাড়ি ধরতাম না,
নব লাখ বাণিজ্যের বেসাত এই নায় বোঝাই করতাম না।
সোঁ-সোঁ-সোঁ-সোঁ, দরিয়াতে দোলে ঢেউ,
এই তুফানেতে কেউ গাঙ পাড়ি দিও না ;
বেসম দৈরার পানি দেইখা ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।

ছিল সোনার দাঁড় পবনের বৈঠা ময়ূর-পঙ্খী নাওখানা ;
চন্দ্র সূরুজ গোলই ভরি ফুল ছড়াইত জোছনা।
এখন উজান বাঁকের বখেটেতে করল দখল নাওখানা,
তারা আচম্বিতে নিল লুটে নব লাখ রতন সোনা।
কল কল ছল ছল, করে জল টল মল,
আগে চল—আগে চল, নাই বল—তবু চল,
ওরে মাঝি, তুই কেন হলি আজি বিমনা,—
ও তোর সামনে নাচে বিজলি লয়ে কন্যা সোনার বরনা।

(১০)

নিশিতে যাইও ফুলবনে
—রে ভোমরা!
নিশিতে যাইও ফুলবনে
জ্বালায়ে চন্দের বাতি,
আমি জেগে রব সারা-রাতি গো ;
কব কথা শিশিরের সনে
—রে ভোমরা!

নিশিতে যাইও ফুলবনে।
যদিবা ঘুমায়ে পড়ি—
স্বপনের পথ ধরি গো,
যেও তুমি নীরব চরণে
—রে ভোমরা!
(আমার ডাল যেন ভাঙে না
আমার ফুল যেন ভাঙে না,
ফুলের ঘুম যেন ভাঙে না)।
যেও তুমি নীরব চরণে
—রে ভোমরা!
নিশিতে যাইও ফুলবনে।

(১১)

ফুল যদি হইতাম বন্ধু
পরতা গলার মালা,
বাতাসে ছড়ায়া বাস
জুড়াইতাম জ্বালা।
পাখি যদি হইতাম বন্ধু
উইড়া পড়তাম গায়,
হাতে লয়া করতা আদর
মনে যত চয়।
নিঠুর বিধি গড়ছে মোরে
কইরা কুলের বালা,
কোন পরানে বইব বুকে
তোমার আদর-মালা।
ভাঙ্গা না নৌকায় বন্ধু
তুমি দিলে সোনার গুরা,
ঘোলাটি বিলের জলে
তোমার ডাকে সুরের কোঁড়া।
তুমি তো বে-বুঝ হইছ
কর বে-বুঝের রীতি,
অধম নারীর সঙ্গে
জুড়িলা পীরিতি।

(১৪)

দেখলাম পথ ধারেরে সজনি
ওই সোনার বরনরে খানি,
সিঁদুরিয়া মেঘের থইনেরে
বুকে তীর গেল হানি!
চোখের না জলে চোখ মাজিলাম কত,
তবু ত নারিলাম দেখতেরে তারে করিয়া মনের মতো ;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি!
দেখিতে দেখিতে রূপ দোগুণ হইল
আরো না দেখিতে রূপরে ও মোর পরানে লাগিল ;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি।
গাঙের না জলে আসি সে চাঁদ ভাসিল,
লাগিয়া মনের ঢেউ তারে হেলায় ভাঙিল ;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি।
বাহুখানি না হইয়া হৈত যদি রশি,
জুড়াইতে মনের জ্বালারে গলায় বানতাম কসি,
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি
সে রূপ আগুন অইলে অঞ্চলে জড়ায়া
এ মোর দুস্কের প্রাণ দিতাম পুড়ায়া ;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনবে খানি।
যেনা পন্থে গেল চইলা রাঙা পাও ফেলে,
মনে লইল বুকখানি দেই সেথা মেলে ;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি।
মনে লইল ফুল হয়া ঝরি পন্থ পরে
দুখানি পায়ের তলে যাই যে গো মরে ;

আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি।
মনে লইল তারে আমি বাতাসেতে ধরি,
আমার ফুলের ঘরে রাখি গোপন করি;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি।
আকাশের বিজলি গেল আকাশে মিলায়া,
জড়াতে ইন্দ্রের ধনু বের্থা মেঘের মায়া;
আরে সজনি,
ওই সোনার বরনরে খানি।

(২৬)

ও তুই যারে আঘাত হানিলিরে মনে সেজন কি তোর পর,
সে ত তোরি তরে কেন্দে কেন্দে বেড়ায় দেশান্তর;
রে বন্ধু!
তোরি তরে সাজাইলাম বন-ফুলের ঘর
রে বন্ধু মন-ফুলের ঘর,
ও তুই ভোমর হয়া হানলি কাঁটা সেই না ফুলের পর;
রে বন্ধু!
এক ঘরেতে লাগলে আগুন পোড়ে অনেক ঘর,
মনের আগুন মনই পোড়ায়—নাই কোনো দোসর;
রে বন্ধু!
আগে যদি জানতামরে তোর রূপে আগুন জ্বলে,
আমি রূপ ধুইয়া আগুনের মালা পরতাম নিজ গলে
রে বন্ধু!
চিতার অনলে ঝাঁপ দেয় যেই জন,
ও তার দেহ পোড়ে মনও পোড়ে, পোড়ে তার ক্রন্দন;
রে বন্ধু!
রূপের আগুন মনেই লাগে, লাগে না কার গায়,
ও সে মনে মনেই মন জ্বালায় কেউ নাহি টের পায়;
রে বন্ধু!

তীর যদি বেন্দে গায়ে তাও তো তোলন যায়,
ও তোর কথার আঘাত কোথায় লাগে কেউ নাহি টের পায়
রে বন্ধু!

সোজন বাদিয়ার ঘাট

তিন

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল, দোলায় চেপে যাই;
দোলায় আছে ছপণ কড়ি গনতে গনতে যাই
ও নদীর জলটুকু টলমল করে,
এ নদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে,
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফেটে পড়ে।
—ছেলে-ভুলানো ছড়া

নমুদের মেয়ে আর সোজনের ভারি ভাব দুইজনে,
লতার সঙ্গে গাছের মিলন, গাছের লতার সনে।
সোজন যেন বা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি,
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কূল টানাটানি।
নামেও সোজন, কামেও তেমনি, শান্ত স্বভাব তার,
কূল ভেঙে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার।
দুলালী সে যেন বনের হরিণী, সোজন তাহার বন,
লতা পাতা ফুল ছায়া বিছাইয়া হরণ করিছে মন:
বনের হরিণী থাকে বনে বনে, জানে সে বনের ভাষা,
সে বন ঘিরিয়া মনখানি, তার বাহিরে যায়নি আশা।

সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, পথে যদি দেখা হয়,
যেন রাঙা ঘুড়ি আকাশে উড়াল, হেন তার মনে লয়।
পিছন হইতে সোজন আসিয়া যদিবা হঠাৎ ডাকে,
কুড়ায়ে পাইল পাকা আমটিরে দুলীর এমনি লাগে।
সোজন আসিয়া জাম গাছটির মগডালে যেন উঠি,
মেঘের মতন কালো জামগুলি তুলিতেছে মুঠি মুঠি।

যেন কে তাহারে ধরিয়া রেখেছে এত উঁচু করে তুলে,
কাঁদির খেজুর দুহাতে ধরি সে পাড়িছে মনের ভুলে।
সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, গোলাপ ফুলের গায়,
ছোটো বুলবুলি বাসা বেঁধে যেন পাখার বাতাস খায়।
টুনটুনি পাখি উড়ে এসে যেন তাহার খোঁপায় নাচে,
শাঙ্ক পোকা যেন ঘুরিছে ফিরিছে তাহার চুড়ির কাঁচে।
সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, দুলীর ইচ্ছে করে,
সোজনেরে সে যে লুকাইয়া রাখে সিঁদুর-কৌটো ভরে।
আঁচলখানিরে টানিয়া টানিয়া বড়ো যদি করা যেত,
সোজনেরে সে যে লুকায়ে রাখিত কেউ নাহি খুঁজে পেত।

সোজন না এলে দুলীর সেদিন চারিদিক আন্ধার;
পুতুল তাহার ভেঙে যায় যেন চরণের ঘায়ে কার।
সেই ত সেবার অসুখ করিল দুলী উঠে খুব ভোরে,
সাতটা মহিষ মানিয়া আসিল রক্ষাকালীর দোরে।
একুশ বামুন খাওয়াইবে দুলী সোজন সারিলে পর,
দুশো মোমবাতি মানিয়া আসিল জেন্দা পীরের ঘর।
সোজন যেদিন সারিয়া উঠিল, কী খুশি দুলীর মনে,
খেজুরের আঁটি যত ছিল জমা বিলাইল জনে জনে।
ও পাড়ার সেই পুটি—যারে দুলী চক্ষে দেখিতে নারে,
ঠ্যাংভাঙা তার ছোটো পুতুলটি দিয়েই ফেলিল তারে।
সেদিন তাহার মনে এত খুশি, সে খুশির সরোবরে,
কালী-মাতা তার সাতটি মহিষ হারাইল অকাতরে।
একুশ বামুন ভোজন ছাড়িল, জেন্দা না বলে পীর,
আদায় করিতে পারিল না দাম দুশোটি মোমবাতির।
সোজনেরে ছেড়ে চলে নাকো তার--কখনোই নাহি চলে,
কোনো কাজ তার হতে পারে নাকো সে নাহি নিকটে হলে।

সেই একবার সোজন কেবল গিয়াছিল মামা-বাড়ি
চারিটি দিনের কড়ার করিয়া, মনে আছে সব তারি!
মামার দেশেতে তল্লা বাঁশের খুব ভাল বাঁশি হয়,
দুলীর জন্য এগারটি বাঁশি আনিবে সে নিশ্চয়।

নানান রঙের সজারুর কাঁটা কত পড়ে আছে বনে,
এক বোঝা তার যদি সে না আনে দেখে নিও তক্ষণে।
মামার দেশেতে পদ্মপুকুরে রঙিন ঝিনুক ভাসে;
সাদা দাঁড়-কাক ঘুরিতেছে বনে কাউয়ার ঠুঁটির আশে।
ঘন-বেত ঝাড়ে বেথুল ঝুলিছে, কেউ পায় নিকো খোঁজ,
কাঁদিতে কাঁদিতে খেজুর পাকিয়া ঝরিয়া পড়িছে রোজ।
এর সব কিছু নিয়ে সে আসিবে, তারপর ও-ই বনে,
সারাদিন ভরি অনেক গল্প করিবে যে দুইজনে।
ও পাড়ার মাঠে সেদিন যে তারা দেখে এল চক্ষেতে,
কটার বাসায় ছাও হইয়াছে কুসুম ফুলের খেতে।
দুলী যেন রোজ যাইয়া তাদের আদর করিয়া আসে,
কলমি ফুলের নোলক পরায়ে দেখে যেন আর হাসে।
বনের যেখানে শিমুলের ডালে বাঁধিয়াছে তারা হাঁড়ি,
কোন্ পাখি সেথা বাসা বাঁধে দুলী খোঁজ রাখে যেন তারি।

বেগুনের ডালে টুনটুনি পাখি ডিম যদি পেড়ে যায়,
কারেও কহিলে, সাবধান, যেন কেউ নাহি টের পায়।
এতটুকু দুটি ছোটো ছাও হবে, সেদিন একটা ধরে,
খোপায় যে তোর বেঁধে দিয়ে তারে উড়াইব মজা করে।
আর শোন্ দুলী, তোদের বাড়ির বিড়ালের ছাওগুলি,
এরই মাঝে যদি চোখ মেলে চায় মোরে যাস নাকো ভুলি।
একটি আমারে দিতেই হইবে, কেহ যেন নাহি লয়,
মোরে ছুঁয়ে তুই কীরা কাট দেখি—বাস, হলো প্রত্যয়!

সকল শপথ রেখেছে সোজন আমরা বলিতে পারি,
এত লোক গাঁয়ে, সাধে কি সোজন মনের মতন তারি!
সোজনের মতো ছেলেই হয় না, তোমরা কি জান তার,
রাঙা ঘুড়িখানি তার চেয়ে ভালো পারে কেহ উড়াবার!
সোজন বলেছে, দরকার হলে ঘুড়ির সূত্র ধরে,
ও-ই আকাশেতে উড়িয়া যাইতে পারে সে হাওয়ার ভরে।
সেখানে নিতুই কত তারা-ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া হাসে।
সেথায় গাঁথিয়া তারার মালা সে বসিবে চাঁদের পাশে।

শেষ রাতে দুলী উঠানে আসিয়া তারে যেন ডাক দ্যায়
পোড়া চোখে তার এত ঘুম তাই ডাকিতে পারেনি তায়!
আচ্ছা, সোজন মানুষ না হয়ে হতো যদি ফুল-তারা,
চাঁদ যদি হতো তখন তাহারে মানাত কেমন ধারা!
তাহলে হয়ত সোজন তাহারে চিনিতেই পারিত না,
এ সব না হয়ে যে চাষীদের ছেলে, কম সে তা বলে না।
বাপ যদি তারে সোজনের সাথে দিয়েই ফেলে বা বিয়ে,
ধ্যেৎ—তা হলে সে কেমনে বাঁচিবে লজ্জা সরম নিয়ে।

সোজনেরো বড়ো ভালো লাগে এই নমুদের মেয়েটিরে,
তার জীবনের অনেক কাহিনী লেখা আছে এরে ঘিরে।
সোজন যখন বড়ো হবে খুব—খুব বড়ো একেবারে,
যখন তখন ইচ্ছা মাফিক যা কিছু করিতে পারে;
তখন যে হয়ে দূরদেশী কোনো পাটের নায়ের ভাগী,
যাবে সে পারায়ে কত খাল বিল সুদূর হাটের লাগি;
সেথায় জমায়ে বহু টাকাকড়ি ফিরিয়া আসিবে ঘরে,
শপথ করে সে মধুমালা শাড়ি আনিবে দুলীর তরে।
দুলী কহে সেথা সিঁদুরকৌটা শঙ্খের চুড়ি আর,
ময়ূরের পাখা যদি মেলে যেন ভুলে না সে কিনিবার।

সোজন যখন কৃষাণ হইবে, সবগুলো খেত ভরি,
কুসুম ফুলের করিবে সে চাষ মনের মতন করি!
ফাগুনে যেদিন সারা খেত ভরি আঁকিবে রঙের চিন,
কুসুমে কুসুমে চরণ ঘষিয়া কাটিবে দুলীর দিন।
পাট মেরে সে যে নিড়াইয়া দিবে বউ-টুবানির চারা
খেত ভরি হবে ফুলের বাহার দুলীর খুশির পারা।
বাড়ির পালানে কুমড়া লাগাবে নহে কুমড়ার তরে,
কুমড়ার ফুল ভালোবেসে দুলী যদিবা খোঁপায় পরে।

মদনের বাপ ভালো লোক নয়, তাহার খেতের মাঝে,
মটরের শাক তুলিতে গেলেই গাল দেয় বড়ো ঝাঁজে।
বাছাই করিয়া করিবে সোজন মাঘী মটরের চাষ,
শাক তুলে তুলে সেদিন দুলীর পুরিবে মনের আশ।

জমিরের খেতে ছাই মিঠে আলু দেখো সোজনের খেতে,
শাকের মামুদ আলু হবে কেউ হেরেনি বা চক্ষেতে।
দুলীর সঙ্গে তার ভারি ভাব, দুলীর খুশির তরে,
হেন কাজ নাই যাহা কোনোদিন সোজন না পারে করে।

চার

দুবলার শিষে যেমন নীহারের পানি,
কোন জনা বেইমানে কইছে এই দেহ হাপনি!
বড়ো ঘর বান্দ্যাছাও মনা-ভাই, বড়ো করছ আশা,
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খি ছাড়বে বাসা।
—মুর্শিদা গান

দীঘিতে তখনো শাপলা ফুলেরা হাসছিল আনমনে,
টৈর পায় নিকো পাণ্ডুর চাঁদ ঝুমিছে গগনকোণে।
উদয়তারার আকাশ-প্রদীপ দুলিছে পুবের পথে,
ভোরের সারথি এখনো আসেনি রক্ত-ঘোড়ার রথে।
গোরস্থানের কবর খুঁড়িয়া মৃতেরা বাহির হয়ে,
সাবধান-পদে ঘুরিছে ফিরিছে ঘুমন্ত লোকালয়ে,
মৃত জননীরা ছেলে-মেয়েদের ঘরের দুয়ার ধরি,
দেখিছে তাদের জোনাকি আলোয় ক্ষুধাতুর আঁখি ভরি।
মরা শিশু তার ঘুমন্ত মার অধরেতে দিয়ে চুমো,
কাঁদিয়া কহিছে, 'জনমদুখিনী মারে, তুই ঘুমো ঘুমো।'
ছোটো ভাইটিরে কোলেতে তুলিয়া মৃত বোন কেঁদে হারা,
ধরার আগুনে সাজাবে না আর খেলাঘরটিরে তারা।
দূর মেঠো পথে প্রেতেরা চলেছে আলেয়ার আলো বয়ে,
বিলাপ করিছে শ্মশানের সব ডাকিনী-যোগিনী লয়ে।
রহিয়া রহিয়া মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শিস,
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশদিশ।
আকাশের নাটমঞ্চে নাচিছে অপ্সরী তারাদল,
দুগ্ধ ধবল ছায়াপথ দিয়ে উড়াইয়া অঞ্চল।
কল্পপরী আর নিদ্রাপরীরা পালঙ্ক লয়ে শিরে,
উড়িয়া চলেছে স্বপনপুরীর মধুমালা-মন্দিরে।

হেনকালে দূর গ্রামপথ হতে উঠিল আজান-গান,
তালে তালে তার দুলিয়া উঠিল স্তব্ধ এ ধরাখান।
নিত্য শুনি যে আজানের সুর—পরানহরণ গান,
কি মধুর যেন পেলব পরশে জুড়াইয়া যায় প্রাণ;
আজকে সে সুরে ধ্বনিতেছে যেন কী এক অশুভ বাণী,
কোনো সে ভীষণ ঘটনা ঘটিবে কোথায় যে নাহি জানি!
কঠিন কঠোর আজানের ধ্বনি উঠিল গগন-জুড়ে—
সুরেরে কে যেন উঁচু হতে আরো উঁচুতে দিতেছে ছুঁড়ে।
পূর্ব আকাশে রক্তবরন দাঁড়াল পিশাচী এসে,
ধরণী ভরিয়া লহু উগারিয়া বিকট-দশনে হেসে।
ডাক শুনি তার কবরে যাইয়া পালাল মৃতের দল,
শ্মশানঘাটায় দৈত্য-দানার থেমে গেল কোলাহল।
গগনের পথে সহসা নিভিল তারার প্রদীপমালা,
চাঁদ জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল ভরি গগনের থালা।
তখনো কঠোর আজান ধ্বনিছে, সাবধান, সাবধান,
ভয়াল বিশাল প্রলয় বুঝিবা নিকটেতে আগুয়ান।
ওরে ঘুমন্ত—ওরে নিদ্রিত—ঘুমের বসন খোল,
ডাকাত আসিয়া ঘিরিয়াছে তোর বসত বাড়ির টোল।
শয়ন-ঘরেতে বাসা বাঁধিয়াছে যত না সিধেল চোরে,
কণ্ঠ হইতে গজমতি হার নিয়ে যাবে চুরি করে।

শয়ন হইতে জাগিল সোজন, মনে হইতেছে তার,
কোন্ অপরাধ করিয়াছে যেন জানে না সে সমাচার;
চাহিয়া দেখিল, চালের বাতায় ফেটেছে বাঁশের বাঁশি,
ইঁদুর আসিয়া থলি কেটে তার ছড়ায়েছে কড়িরাশি।
বার বার করে বাঁশিরে বকিল, ইঁদুরেরে দিল গালি,
বাঁশি ও ইঁদুর বুঝিল না মানে, সেই তা শুনিল খালি;
তাড়াতাড়ি উঠি বাঁশিটি লইয়া দুলীদের বাড়ি বলি,
চলিল সে একা রাঙা প্রভাতের আঁকা-বাঁকা পথ দলি।
খেজুরের গাছে পেকেছে খেজুর, ঘন-বন-ছায়া-তলে,
বেথুল ঝুলিছে বার বার করে দেখিল সে কুতূহলে।

ও-ই আগডালে পাকিয়াছে আম, ইসরে রঙের ছিরি।
একে ঢিলেতে এখনি সে তাহা আনিবারে পারে ছিঁড়ি!
দুলীরে ডাকিয়া দেখাবে এসব, তারপর দুইজনে,
পাড়িয়া পাড়িয়া ভাগ বসাইবে ভুল করে গনে গনে।
এমনি করিয়া এটা ওটা দেখি বহুখানে দেরি করি,
দুলীদের বাড়ি এসে পৌঁছিল খুশিতে পরান ভরি।
‘দুলী শোন্ এসে—ওকীরে এখনো ঘুমিয়ে যে রয়েছিস?
ও পাড়ার লালু খেজুর পাড়িয়া নিয়ে গেলে দেখে নিস!
সিঁদুরিয়া গাছে পাকিয়াছে আম, শিগগির চলে আয়,
আর কেউ এসে পেড়ে যে নেবে না, কী করে বা বলা যায়।’

এ খবর শুনে হুড়মুড় করে দুলী আসছিল ধেয়ে,
মা বলিল, ‘এই ভর সকালে কোথা যাস ধাড়ী মেয়ে?
সাতটা শকুনে খেয়ে না কুলোয় আধেক বয়সী মাগি,
পাড়ার ধাঙড় ছেলেদের সনে আছেন খেলায় লাগি!
পোড়ারমুখীলো তোর জন্যেতে পাড়ায় যে টেকা ভার,
চুন নাহি ধারি এমন লোকেরো কথা হয় শুনিবার।’

এ সব গালির কী বুঝিবে দুলী, বলিল একটু হেসে,
‘কোথায় আমার বয়স হয়েছে, দেখেই না কাছে এসে!
কালকে ত আমি সোজনের সাথে খেলতে গেলাম বনে,
বয়স হয়েছে এ কথা ত তুমি বল নাই তক্ষণে।
এক রাতে বুঝি বয়স বাড়িল? মা তোমার আমি আর
মাথার উকুন বাছিয়া দিব না, বলে দিনু এইবার।’
ইহা শুনি মার রাগের আগুন জ্বলিল যে গিঠে গিঠে,
গুড়ুম গুড়ুম তিন চার কিল মারিল দুলীর পিঠে।
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাহিয়া সোজন দেখিল এ অবিচার,
কোনো হাত নাই করিতে তাহার আজি এর প্রতিকার।
পায়ের উপরে পা ফেলিয়া পরে চলিল সমুখ পানে,
কোথায় চলেছে কোন পথ দিয়ে, এ খবর নাহি জানে।
দুই ধারে বন লতায়-পাতায় পথেরে জড়াতে চায়,
গাছের উপরে ঝালর ধরেছে শাখা বাড়াইয়া বায়।

সম্মুখ দিয়া শুয়োর পালাল, ঘেড়েল ছুটিল দূরে,
শেয়ালের ছাও কাঁদন ছাড়িল সারাটি বনানী জুড়ে।
একেলা সোজন কেবলি চলেছে, কালো কুজ্ঝটি পথ,
ভর-দুপুরেও নামে না সেথায় রবির চলন রথ।
রক্ত ঝরিছে বেতসের শিষে শরীরের চাম ছিঁড়ে,
সাপের ছেলম পায়ে জড়ায়েছে, মাকড়ের জাল শিরে।
এমনি করিয়া বহু ক্ষণ পরে রায়ের দীঘির পাড়ে,
দাঁড়াল আসিয়া ঘন বেত ঘেরা একটি ঝোপের ধারে।

এই রায়-দীঘি, ধাপ-দামে এর ঘিরিয়াছে কালোজল,
কলমি লতায় বাঁধিয়া রেখেছে কল ঢেউ চঞ্চল।
চারিধারে এর কর্দম মথি বুনো শূকরের রাশি,
শালুকের লোভে পদ্মের বন লুণ্ঠন করে আসি।
জল খেতে এসে গোখুরা সাপের চিহ্ন এঁকেছে তীরে,
কোথাও গাছের শাখায় তাদের ছেলম রয়েছে ছিঁড়ে।
রাত্রে হেথায় আগুন জ্বালায় নর-পিশাচের দল,
মড়ার মাথায় শিস দিয়ে দিয়ে করে বন চঞ্চল।
রায়েদের বউ গলবন্ধনে মরেছিল যার শাখে,
সেই নিমগাছ ঝুলিয়া পড়িয়া আজো যেন কারে ডাকে।
এইখানে এসে মিছে ঢিল ছুঁড়ে নাড়িল দীঘির জল,
গাছেরে ধরিয়া ঝাঁকিল খানিক, ছিঁড়িল পদ্মদল।
তারপর শেষে বসিল আসিয়া, নিমগাছটির ধারে,
বসে বসে কী যে ভাবিতে লাগিল, সে-ই তা বলিতে পারে।

পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়া কে তাহার চোখ ধরি,
চুড়ি বাজাইয়া কহিল, 'কে আমি বল দেখি ঠিক করি।'

'ও পাড়ার সেই হারানের পোলা।' 'ইস'—'শোনো বলি তবে
নবীনের বোন বাতাসী কিম্বা উল্লাসী তুমি হবে!'

'পোড়ারমুখীরা এখনি মরুক'—'অহ' আহা বড়ো লাগে,
কোথাকার এক ব্রহ্মদৈত্য কপালে চিমটি দাগে।'

'হয়েছে হয়েছে, বিপিনের খুড়ো মরিল যে গত মাসে,
সেই আসিয়াছে, দোহাই! দোহাই!! বাঁচি না যে খুড়ো ত্রাসে!'
'ভারি ত সাহস!' এই বলে দুলী খিল্ খিল্ করে হাসি,
হাত খুলে নিয়ে সোজনের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল আসি।

'একি, তুই দুলী!' বুঝি বা সোজন পড়িল আকাশ হতে,
চাপা হাসি তার ঠোঁটের বাঁধন মানে না যে কোনো মতে।
দুলী কহে, 'দেখ! তুই ত আসিলি, মা তখন মোরে কয়,
বয়স বুঝিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়।
ওপাড়ার খেঁদি, পোড়ারমুখীরে ঝেঁটিয়ে করিব সারা,
আর জগাপিসি, মায়ের নিকটে যা তা বলিয়াছে তারা।
বয়স হয়েছে আমাদের থেকে ওরাই জানিল আগে,
ইচ্ছে যে করে উহাদের মুখে হাতা পুড়াইয়া দাগে।
আচ্ছা সোজন! সত্যি করেই বয়স যদি বা হতো,
আর কেউ তাহা জানিতে পারিত এই আমাদের মতো?'

ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল সোজন, 'আমি ত ভেবে না পাই,
এতদিন মোরা এত খেলিলাম বয়স ত আসে নাই!
আজকে হঠাৎ বয়স আসিল? আসিলই যদি শেষে,
কথা কহিল না, অবাক কাণ্ড দেখি নাই কোনো দেশে।'
দুলালী কহিল, 'আচ্ছা সোজন, বল দেখি তুই মোরে,
বয়স কেমন, কোথায় সে থাকে, আসে বা কেমন করে?'
'তাও না জানিস' সোজন কহিল, 'পাকা চুল ফুরফুরে,
লাঠি ভর দিয়ে চলে পথে পথে বুড়ো সে যে থুরথুরে।'
'দেখ দেখি ভাই, মিছে বলিসনে, আমার মাথার চুলে,
সেই বুড়ো আজ পাকা চুল লয়ে আসে নাই ত রে ভুলে?'
দুলীর মাথার বেণীটি খুলিয়া সবগুলো চুল ঝেড়ে,
অনেক করিয়া খুঁজিল সোজন বুড়োনি সেথায় ফেরে।
দুলীর মুখ ত সাদা হয়ে গেছে যদি বা সোজন বলে,
বয়স আজিকে এসেছে তাহার মাথার কেশেতে চলে!
বহুখন খুঁজি কহিল সোজন—'নারে না, কোথাও নাই,
তোর চুলে সেই বয়স বুড়োর চিহ্ন না খুঁজে পাই!'

দুলালী কহিল, ‘এক্ষুনি আমি জেনে আসি মার কাছে,—
আমার চুলেতে বয়সের দাগ কোথা আজ লাগিয়াছে।’
দুলী যেন চলে যায়ই আর কী, সোজন কহিল তারে,
‘এক্ষুনি যাবি? আয় না একটু খেলিগে বনের ধারে।’

বউ-কথা-কও, গাছের উপরে ডাকছিল বৌ-পাখি,
সোজন তাহারে রাগাইয়া দিল তার মতো ডাকি ডাকি।
দুলীর তেমনি ডাকিতে বাসনা, মুখে না বাহির হয়,
সোজনেরে বলে, ‘শেখা না কী করে বউ-কথা-কও হয়?’

দুলীর দুখানা ঠোঁটেরে বাঁকায়ে খুব গোল করে ধরে,
বলে, ‘এইবার শিস্ দে ত দেখি পাখির মতন স্বরে।’
দুলীর যতই ভুল হয়ে যায় সোজন ততই রাগে,
হাসিয়া তখন দুলীর দুঠোঁট ভেঙে যায় হেন লাগে।
‘ধ্যেৎ বোকা মেয়ে, এই পারলি নে জিভটা এমনি করে,
ঠোঁটের নীচেতে বাঁকালেই তুই ডাকিবি পাখির স্বরে।’

এক একবার দুলালী যখন পাখির মতন ডাকে।
সোজনের সেকী খুশি, মোরা কেউ হেন দেখি নাই তাকে।
‘দেখ তুই যদি আর এতটুকু ডাকিতে পারিস ভালো,
কাল তোর ভাগে যত পাকা জাম হবে সবচেয়ে কালো।
বাঁশের পাতার সাতখানা নথ গড়াইয়া দেব তোরে,
লাল কুঁচ দেব, খুব বড়ো মালা গাঁথিস যতন করে।’

দুলী কয়, ‘তোর মুখ-ভরা গান, দে না মোর মুখে ভরে,
এই আমি ঠোঁট খুলে ধরিলাম দম যে বন্ধ করে!’
‘দাঁড়া তবে তুই’ বলিয়া সোজন মুখ বাড়ায়েছে যবে,
দুলীর মাতা যে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল কলরবে।
‘ওরে ধাড়ী মেয়ে, সাপে বাঘে কেন খায় না ধরিয়া তোরে,
এতকাল আমি ডাইনী পুষেছি আপন জঠরে ধরে।
দাঁড়াও সোজন, আজকেই আমি তোমার বাপেরে ডাকি
শুধাইব, এই বেহায়া ছেলের শাস্তি সে দেবে নাকি?’

এই কথা বলে দুলালীরে সে যে কিল থাপ্পড় মারি,
টানিতে টানিতে বুনো পথ বেয়ে ছুটিল আপন বাড়ি।
একলা সোজন বসিয়া রহিল পাথরের মতো হায়,
ভাবিবারও আজ মনের মতন ভাষা সে খুঁজে না পায়।

দশ

মনের মতন মানুষ নাই যে দেশে
    সেদেশে কেমনে থাকি।
    মনের দুখ মনে রেখে
আমি আর কতকাল নিজেরে ভুলায়ে রাখি।
দেশের বুকে আগুন দিয়া
    মনে করে সই যাই চলিয়া,
    যেথায় যায় দুই আঁখি;
পোড়া বিধি হয়ে বাদী—
    আমায় করেছে পিঞ্জিরার পাখি।

—বিচ্ছেদ গান

নমুর পাড়ায় বিবাহের গানে আকাশ বাতাস
    উঠিয়াছে আজি ভরি,
থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে উলু, ঢোল ও সানাই
    বাজিতেছে গান ধরি।
রামের আজিকে বিবাহ হইবে, রামের মায়ের
    নাহি অবসর মোটে
সোনার বরন সীতারে বরিতে কোনোখানে আজ
    দূর্বা ত নাহি জোটে।
কোথায় রহিল সোনার ময়ূর! গগনের পথে
    যাওরে উড়াল দিয়া,
মালঞ্চঘেরা মালিনীর বাগ হইতে গো তুমি
    দূর্বা যে আনো গিয়া;
এমনি করিয়া গেঁয়ো মেয়েদের করুণ সুরের
    গানের লহরী পরে,
কত সীতা আর রাম লক্ষ্মণ বিবাহ করিল
    দূর অতীতের ঘরে।

কেউ বা সাজায় বিয়ের কনেরে কেউ বাঁধে বাড়ে
      ব্যস্ত হইয়া বড়ো,
গদাই নমুর বাড়িখানি যেন ছেলেমেয়েদের
      কলরবে নড় নড়।
দূরে, গাঁর পাশে বনের কিনারে দুজন কাহারা
      ফিস ফিস কথা কয়,
বিবাহবাড়ির এত সমারোহ সেদিকে কাহারো
      ভ্রূক্ষেপ নাহি হয়!
'সোজন আমার বিবাহ আজিকে, এই দেখো আমি
      হলুদে করিয়া স্নান,
লাল চেলি আর শাঁখা-সিঁদুর আলতার রাগে
      সাজায়েছি দেহখান।
তোমারে আজিকে ডাকিয়াছি কেন, নিকটে আসিয়া
      শুন তবে কান পাতি,
এই সাজে আজ বাহির হইব যেথা যায় আঁখি,
      তুমি হবে মোর সাথী।'

'কী কথা শুনালে অবুঝ, এখনো ভাল ও মন্দ
      বুঝিতে পারনি হায়,
কাঙ্কাবাঁশের কঞ্চিরে আজি যেদিকে বাঁকাও,
      সেদিকে বাঁকিয়ে যায়!'

'আমি ত না জানি, শিশুকাল হতে তোমারে ছাড়িয়া,
      বুঝি নাই আর কারে,
আমার জীবনে এক সাথে রব এই কথা তুমি
      বলিয়াছ বারে বারে।
এক বোঁটে মোরা দুটি ফুল ছিনু, একটিরে তার
      ছিঁড়ে নেয় আর জনে,
সে ফুলেরে তুমি কাড়িয়া লবে না? কোনো কথা আজ
      কহে না তোমার মনে?
ভাবিবার আর অবসর নাহি, বনের আঁধারে
      মিশিয়াছে পথখানি,

দুটি হাত ধরে সেই পথে আজ, যত জোরে পার
মোরে নিয়ে চলো টানি।
এখনি আমারে খুঁজিতে বাহির হইবে ক্ষিপ্ত
যত না নমুর পাল,
তার আগে মোরা বন ছাড়াইয়া পার হয়ে যাব
কুমার নদীর খাল।
সেথা আছে ঘোর অতসীর বন, পাতায় পাতায়
ঢাকা তার পথগুলি,
তারি মাঝ দিয়া চলে যাব মোরা, সাধ্য কাহার
সে পথের দেখে ধূলি।'

'হায় দুলী! তুমি এখনো অবুঝ, বুদ্ধি-সুদ্ধি
কখন বা হবে হায়,
এ পথের কী বা পরিণাম তুমি ভাবিয়া আজিকে
দেখিয়াছ কভু তায়?
আজ হোক্ কিবা কাল হোক্ মোরা ধরা পড়ে যাব
যে কোনো অশুভ ক্ষণে,
তখন মোদের কী হবে উপায়, এই সব তুমি
ভেবে কি দেখেছ মনে?
তোমারে লইয়া উধাও হইব, তারপর যবে
ক্ষিপ্ত নমুর দল,
মোর গাঁয়ে যেয়ে লাফায়ে পড়িবে দাদ নিতে এর
লইয়া পশুর বল;
তখন তাদের কী হবে উপায়? অসহায় তারা
—না না, তুমি ফিরে যাও!
যদি ভালোবাস, লক্ষ্মী মেয়েটি, মোর কথা রাখ,
নয় মোর মাথা খাও।'

'নিজেরি স্বার্থ দেখিলে সোজন, তোমার গেরামে
ভাই বন্ধুরা আছে,
তাদের কী হবে! তোমার কী হবে! মোর কথা তুমি
ভেবে না দেখিলে পাছে?

এই ছিল মনে, তবে কেন মোর শিশুকালখানি
তোমার কাহিনী দিয়ে,
এমন করিয়া জড়াইয়াছিলে ঘটনার পর
ঘটনারে উল্টিয়ে?
আমার জীবনে তোমারে ছাড়িয়া কিছু ভাবিবারে
অবসর জুটে নাই,
আজকে তোমারে জনমের মতো ছাড়িয়া হেথায়
কী করে যে আমি যাই!
তোমার তরুতে আমি ছিনু লতা, শাখা দোলাইয়া
বাতাস করেছ যারে,
আজি কোন প্রাণে বিগানার দেশে, বিগানার হাতে
বনবাস দিবে তারে?
শিশুকাল হতে যত কথা তুমি সন্ধ্যাসকালে
শুনায়েছ মোর কানে,
তারা ফুল হয়ে, তারা ফল হয়ে পরান-লতারে
জড়ায়েছে তোমা পানে।
আজি সে কথারে কী করিয়া ভুলি? সোজন! সোজন!
—মানুষ পাষাণ নয়।
পাষাণ হইলে আঘাতে ফাটিয়া চৌচির হতো,
পরাণ কি তাহা হয়?
ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে, তখনি তা মোছে
ঠোঁটেরি হাসির ঘায়,
কথার লেখা যে মেহেদির দাগ—যত মুছি তাহা
তত ভালো পড়া যায়!
নিজেরি স্বার্থ দেখিলে আজিকে, বুঝিলে না এই
অসহায় বালিকার,
দীর্ঘ জীবন কী করে কাটিবে তাহারি সঙ্গে
কিছু নাহি জানি যার।
মন সে তো নহে কুমড়ার ফালি, যাহারে তাহারে
কাটিয়া বিলানো যায়,
তোমারে যা দিছি, অপরে তা যবে জোর করে চাবে
কী হবে উপায় হায়।’

'জানি আমি জানি, আমারে ছাড়িতে তোমার মনেতে
    জাগিবে কতেক ব্যথা,
তবু সে ব্যথারে সহিও গো তুমি শেষ এ মিনতি,
    করিও না অন্যথা।
আমার মনেতে আশ্বাস রবে, একদিন তুমি
    ভুলিতে পারিবে মোরে,
সেই দিন যেন দূরে নাহি রয়, এ আশিস আমি
    করে যাই বুক ভরে।
এইখানে মোরা দুইজনে মিলি গড়িয়াছিলাম
    বট-পাকুড়ের চারা।
নতুন পাতায় লহর মেলিয়া, এ ওরে ধরিয়া
    বাতাসে দুলিছে তারা।
সরু ঘট ভরি জল এনে মোরা প্রতি সন্ধ্যায়
    ঢালিয়া এদের গোড়ে
আমাদের ভালোবাসারে আমরা দেখিতে পেতাম
    ইহাদের শাখা পরে।
সামনে দাঁড়িয়ে মাগিতাম বর—এদের মতন
    যেন এ জীবন দুটি,
শাখায় জড়ায়ে, পাতায় জড়ায়ে এ-ওরে লইয়া
    সামনেতে যায় ছুটি।
এ গাছের আর কোন প্রয়োজন? এসো দুইজনে
    ফেলে যাই উপাড়িয়া,
নতুবা ইহারা আর কোনোদিনে এইসব কথা
    দিবে মনে করাইয়া।
ওইখানে মোরা কদমের ডাল টানিয়া বাঁধিয়া
    আম্রশাখার সনে,
দুইজনে বসি ঠিক করিতাম, কেবা হবে বর,
    কেবা হবে তার কনে।
আম্রশাখার মুকুল হইলে, কদম গাছেরে
    করিয়া তাহার বর,
মহাসমারোহে বিবাহ দিতাম মোরা দুইজনে
    সারাটি দিবস ভর।

আবার যখন মেঘলার দিনে কদম্বশাখা
    হাসিত ফুলের ভারে,
কত গান গেয়ে বিবাহ দিতাম আমের গাছের
    নববধূ করে তারে।
বরনের ডালা মাথায় করিয়া পথে পথে ঘুরে
    মিহি সুরে গান গেয়ে,
তুমি যেতে যবে তাহাদের কাছে, আঁচল তোমার
    লুটাত জমিন ছেয়ে।
দুইজনে মিলে কহিতাম যদি মোদের জীবন
    দুই দিকে যেতে চায়,
বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিব, যেমনি আমরা
    বেঁধেছি এ দুজনায়।
আজিকে দুলালী, বাহুর বাঁধন হইল যদি বা
    স্বেচ্ছায় খুলে দিতে,
এদেরো বাঁধন খুলে নেই, যেন এই সব কথা
    কভু নাহি আনে চিতে।'

'সোজন! সোজন! তার আগে তুমি, সে লতার বাঁধ
    ছিঁড়িল আজিকে হাসি,
এই তরুতলে সেই লতা দিয়ে আমারো গলায়
    পরাইয়া যাও ফাঁসি।
কালকে যখন আমার খবর শুধাবে সবারে
    হতভাগা বাপ-মার,
কহিও তাদের, গহন বনের নিদারুণ বাঘে
    ধরিয়া খেয়েছে তায়।
যেই হাতে তুমি উপাড়ি ফেলিলে শিশু বয়সের
    বট-পাকুড়ের চারা,
সেই হাতে এসো ছুরি দিয়ে তুমি আমারো গলায়
    ছুটাও লহুর ধারা।
কালকে যখন গাঁয়ের লোকেরা হতভাগিনীর
    পুছিবে খবর এসে,
কহিও দারুণ সাপের কাপড়ে মরিয়াছে সে যে
    গভীর বনের দেশে।

কহিও, অভাগী ঝালী না বিষের লাড়ু বানাইয়া
খাইয়াছে নিজ হাতে,
আপনার ভরা ডুবায়েছে সে যে অথই গভীর
কূলহীন দরিয়াতে।'

'ছোটো বয়সের সেই দুলী তুমি, এত কথা আজ
শিখিয়াছ বলিবারে,
হায়, আমি কেন সায়রে ভাসানু দেবতার ফুল—
সরলা এ বালিকারে।
আমি জানিতাম, তোমার লাগিয়া তুষের অনলে
দহিবে আমার হিয়া,
এ-পোড়া প্রেমের সকল যাতনা নিয়ে যাব আমি
মোর বুকে জ্বালাইয়া।
এ মোর কপাল শুধু তো পোড়েনি, তোমারো আঁচলে
লেগেছে আগুন তার ;
হায় অভাগিনী, এর হাত হতে এ জনমে তব
নাহি আর নিস্তার।
তবু যদি পার মোরে ক্ষমা করো তোমার ব্যথার
আমি একা অপরাধী ;
সব তার আমি পূরণ করিব, রোজ কেয়ামতে
দাঁড়াইও হয়ে বাদী।
আজকে আমাকে ক্ষমা করে যাও, সুদীর্ঘ এই
জীবনের পরপারে—
সুদীর্ঘ পথে বয়ে নিয়ে যেয়ো আপন বুকের
বেবুঝ এ বেদনারে।
সেদিন দেখিবে হাসিয়া সোজন খর দোজখের
আতসের বাসখানি
গায়ে জড়াইয়া, অগ্নির যত তীব্র দাহন
বক্ষে লইবে টানি;
আজিকে আমারে ক্ষমা করে যাও, আগে বুঝি নাই
নিজেরে বাঁধিতে হায়,
তোমার লতারে জড়ায়েছি আমি, শাখাবাহুহীন
শুকনো তরুর গায়।

কে আমারে আজ বলে দেবে দুলী, কী করিলে আমি
    আপনারে সাথে নিয়ে,
এ পরিণামের সকল বেদনা নিয়ে যেতে পারি
    কারে নাহি ভাগ দিয়ে।
ওই শুন দূরে ওঠে কোলাহল, নমুরা সকলে
    আসিছে এদিক পানে,
হয়তো এখনি আমাদেরে তারা দেখিতে পাইবে
    এইভাবে এইখানে।'

'সোজন! সোজন। তোমরা পুরুষ, তোমারে দেখিয়া
    কেউ নাহি কিছু করে।
ভাবিয়া দেখেছ, এইভাবে যদি তারা মোরে পায়,
    কীবা পরিণাম হবে।
তোমরা পুরুষ সম্মুখে পিছনে যেদিকেই যাও,
    চারিদিকে খোলা পথ,
আমরা যে নারী, সমুখ ছাড়িয়া যে দিকেতে যাব,
    বাধাঘেরা পর্বত।
তুমি যাবে যাও, বারণ করিতে আজিকার দিনে
    সাধ্য আমার নাই,
মোরে নিয়ে গেলে কলঙ্ক ভার, মোর পথে যেন
    আমি তা বহিয়া যাই;
তুমি যাবে যাও, আজিকার দিনে এই কথাগুলি
    শুনে যাও শুধু কানে,
জীবনের যত ফল নিয়ে গেল কণ্টকতরু
    বাড়ায়ে আমার পানে।
বিবাহের বধূ পালায়ে এসেছি, নমুরা আসিয়া
    এখনি খুঁজিয়া পাবে,
তারপর তারা আমারে ঘিরিয়া অনেক কাহিনী
    রটাবে নানান ভাবে।
মোর জীবনের সুদীর্ঘ দিনে সেইসব কথা
    চোরকাঁটা হয়ে হায়,
উঠিতে বসিতে পলে পলে আসি নব নব রূপে
    জড়াবে সারাটি গায়।

তবু তুমি যাও, আমি নিয়ে গেনু এ পরিণামের
যত কলঙ্ক-জ্বালা,
তুমি নিয়ে যাও, সে সুখ-তরুর যত ফুল আর
যত গাঁথা ফুল-মালা।
ক্ষমা করো তুমি, ক্ষমা করো মোরে, আকাশ সায়রে
তোমার চাঁদের গায়,
আমি এসেছিনু, মোর জীবনের যত কলঙ্ক
মাখাইয়া দিতে হায়।
সে পাপের যত শাস্তিরে আমি আপনার হাতে
নীরবে বহিয়া যাই,
আজ হতে তুমি মনেতে ভাবিও, দুলী বলে পথে
কারে কভু দেখ নাই।
সোঁতের শেহলা, ভেসে চলে যাই দেখা হয়েছিল
তোমার নদীর কূলে,
জীবনেতে আছে বহু সুখ-হাসি, তার মাঝে তুমি
সে কথা যাইও ভুলে।
যাইবার কালে জনমের মতো শেষ পদধূলি
লয়ে যাই তবে শিরে,
আশিস্ করিও, সেই ধূলি যেন শত ব্যথা মাঝে
রহে অভাগীরে ঘিরে।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য, সাক্ষী থাকিও
হে বনের গাছ-পালা—
সোজন আমার প্রাণের সোয়ামী, সোজন আমার
গলায় ফুলের মালা।
সাক্ষী থাকিও হে দেব-ধর্ম সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
ইহকালে আর পরকালে মোর কেহ কোথা নাই
কেবল সোজন ছাড়া।
সাক্ষী থাকিও দরদের মাতা, সাক্ষী থাকিও
বাপ-ভাই যত জন,
সোজন আমার পরানের পতি, সোজন আমার
মনের অধিক মন।

সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর, সাক্ষী থাকিও
হাতের দুগাছি শাঁখা,
সেজনের কাছ হইতে গেলাম এ জনমে আমি
সবচেয়ে বড় দাগা!'

'দুলী! দুলী! তবে ফিরে এসো তুমি, চলো দুইজনে
যেদিকে চরণ যায়,
আপন কপাল আপনার হাতে যে ভাঙিতে চাহে,
কে পারে ফিরাতে তায়।
ভেবে না দেখিলে, মোর সাথে গেলে কত দুখ তুমি
পাইবে জনম ভরি,
পথে পথে আছে কত কণ্টক, পায়েতে বিঁধিবে
তোমারে আঘাত করি।
দুপুরে জ্বলিবে ভানুর কিরণ, উনিয়া যাইবে
তোমার সোনার লতা।
ক্ষুধার সময় অন্ন অভাবে কমল বরন
মুখে সরিবে না কথা।
রাতের বেলায় গহন বনেতে পাতার শয়নে
যখন ঘুমায়ে রবে,
শিয়রে শোসাবে কাল অজগর, ব্যাঘ্র ডাকিবে
পাশেতে ভীষণ রবে।
পথেতে চলিতে বেতের শিশায় আঁচল জড়াবে,
ছিঁড়িবে গায়ের চাম,
সোনার অঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া ঝরিয়া পড়িবে
লহুধারা অবিরাম।
সেদিন তোমার এই পথ হতে ফিরিয়া আসিতে
সাধ্য হবে না আর,
এই পথে যারা এক পাও চলে, তারা চলে যায়
লক্ষ যোজন পার।
এত আদরের বাপ-মা সেদিন বেগানা হইবে
মহা-শত্রুর চেয়ে,
আপনার জন তোমারে বধিতে যেখানে সেখানে
ফিরিবে সবাই ধেয়ে।

সাপের বাঘের ডরেতে এ পথে রহিবে সদাই
যত না শঙ্কাভরে,
তার চেয়ে শত শঙ্কা-আকুল হইবে যে তুমি
বাপ-ভাইদের ডরে।
লোকালয়ে আর ফিরিতে পাবে না, বনের যত না
হিংস্র পশুর সনে,
দিনেরে ছাপায়ে রাতেরে ছাপায়ে রহিতে হইবে
অতীব সঙ্গোপনে।
খুব ভালো করে ভেবে দেখো তুমি, এখনো রয়েছে
ফিরিবার অবসর,
শুধু নিমিষের ভুলের লাগিয়া কাঁদিবে যে তুমি,
সারাটি জনম ভর।'

'অনেক ভাবিয়া দেখেছি সোজন, তুমি যেথা রবে,
সকল জগৎখানি,
শত্রু হইয়া দাঁড়ায় যদিবা, আমি ত তাহারে
তৃণসম নাহি মানি;
গহন বনেতে রাতের বেলায় যখন ডাকিবে
হিংস্র পশুর পাল,
তোমার অঙ্গে অঙ্গ জড়ায়ে রহিব যে আমি,
নীরবে সারাটি কাল;
পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হইয়া এলায়ে পড়িবে
অলস এ দেহখানি,
ওই চাঁদমুখ হেরিয়ে তখন শত উৎসাহ
বুকেতে আনিব টানি।
বৃষ্টির দিনে পথের কিনারে মাথার কেশেতে
রচিয়া কুটিরখানি,
তোমারে তাহার মাঝেতে শোয়ায়ে, সাজাব যে আমি
বনের কুসুম আনি।
ক্ষুধা পেলে তুমি উঁচু ডালে উঠি থোপায় থোপায়
পাড়িয়া আনিও ফল,
বুকের আঁচল টানিয়া যে আমি মুছাইয়া দিব
মুখেতে ঘামের জল।

নল ভেঙে আমি জল খাওয়াইব, বনপথে যেতে
যদি পায়ে লাগে ব্যথা,
গানের সুরেতে শুনাইব আমি শ্রান্তি নাশিতে
সে শিশুকালের কথা।
তুমি যেথা যাবে সেখানে বন্ধু। শিশুবয়সের
দিয়ে যত ভালোবাসা,
বাবুই পাখির মতো উঁচু ডালে অতি সযতনে,
রচিব সুখের বাসা।
দূরের শব্দ নিকটে আসিছে, কথা কহিবার
আর অবসর নাই,
রাতের আঁধারে চলো—এই পথে, আমরা দুজনে
বন-ছায়ে মিশে যাই।'

'সাক্ষী থাকিও আল্লা রসুল, সাক্ষী থাকিও
যত পীর আউলিয়া,
এই হতভাগী বালিকারে আমি বিপদের পথে
চলিলাম আজি নিয়া।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য, সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
আজিকার এই গহন রাতের অন্ধকারেতে
হইলাম ঘরছাড়া।
সাক্ষী থাকিও খোদার আরশ, সাক্ষী থাকিও
নবীর কোরানখানি,
ঘর ছাড়াইয়া, বাড়ি ছাড়াইয়া কে আজ আমারে
কোথা লয়ে যায় টানি!
সাক্ষী থাকিও শিমুলতলীর যত লোকজন,
যত ভাই-বোন সবে,
এ-জনমে আর সোজনের সনে কভু কোনোখানে
কারো নাহি দেখা হবে।
জনমের মতো ছেড়ে চলে যাই শিশুবয়সের
শিমুলতলীর গ্রাম,
এখানেতে আর কোনোদিন যেন নাহি কহে কেহ
সোজন-দুলীর নাম।'

তেরো

দেশাল সিন্দুর চায়নারে ময়না
আবেরি ময়না ঢাকাই সিন্দুর চায়;
ঢাকাই সিন্দুর পরিয়া ময়নার গরমি ছুটে গায়।
ডান হস্তে শ্যামলা গামছা,
বাম হস্তে আবেরি পাঙ্খা,
হারে দামান দুলায় বালির গায়।

—মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান

গড়াই নদীর তীরে,
কুটিরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যাসকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে সিম-লতা আর লাউ-কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোটো ছোটো ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে।
গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।

মটরের ডাল, মুসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লঙ্কা মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ মসুরের রঙ মটরের রঙ আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার।
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি,
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।
সাঁঝ-সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে।
সামনে তাহার ছোটো ঘরখানি ময়ূরপাখির মতো,
চালার দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।

কুটিরখানির একধারে বন, শ্যাম-ঘন-ছায়া তলে,
মহা-রহস্য লুকাইয়া বুকে সাজিছে নানান ছলে।
বনের দেবতা মানুষের ভয়ে ছাড়ি ভূমি সমতল,
সেথায় মেলিছে অতি চুপি চুপি সৃষ্টির কৌশল।
লতা পাতা ফুল ফলের ভাষায় পাখিদের বুনো সুরে,
তারি বুকখানি সারা বন বেড়ি ফিরিতেছে সদা ঘুরে।
ইহার পাশেতে ছোটো গেহ-খানি, এ বনের বন-রানী,
বনের খেলায় হয়রান হয়ে শিথিল বসনখানি;
ইহার ছায়ায় মেলিয়া ধরিয়া শুয়ে ঘুম যাবে বলে,
মনের মতন করিয়া ইহারে গড়িয়াছে নানা ছলে।

সে ঘরের মাঝে দুটি পা মেলিয়া বসিয়া একটি মেয়ে,
পিছনে তাহার কালো চুলগুলি মাটিতে পড়েছে বেয়ে।
দুটি হাতে ধরি রঙিন শিকায় রচনা করিছে ফুল,
বাতাসে সরিয়া মুখে উড়িতেছে কভু দু-একটি চুল।
কুপিত হইয়া চুলেরে সরাতে ছিঁড়িছে হাতের সুতো,
চোখ ঘুরাইয়া সুতোরে শাসায় করিয়া রাগের ছুতো।
তারপর শেষে আপনার মনে আপনি উঠিছে হাসি,
আরো সরু সরু ফুল ফুটিতেছে শিকার জালেতে আসি।
কালো মুখখানি, বনলতা-পাতা আদর করিয়া তায়,
তাহাদের গার যত রঙ যেন মেখেছে তাহার গায়।
বনের দুলালী ভাবিয়া ভাবিয়া বনের শ্যামল কায়া,
জানে না কখন ছড়ায়েছে তার অঙ্গে বনের ছায়া।
আপনার মনে শিকা বুনাইছে, ঘরের দুখানা চাল,
দুখানা রঙিন ডানায় তাহারে করিয়াছে আব-ডাল।
আটনের গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারুকাজ,
বাজারের সাথে পরদা বাঁধন মেলে প্রজাপতি সাজ;
ফুস্যির সাথে রাঙতা জড়ায়ে গোখুরা বাঁধনে আঁটি,
উলু ছোন দিয়ে ছাইয়াছে ঘর বিছায়ে শীতল পাটি।
মাঝে মাঝে আছে তারকা বাঁধন, তারার মতন জ্বলে,
রুয়ার গোড়ায় খুব ধরে ধরে ফুল কাটা শতদলে।

তারি গায় গায় সিঁদুরের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো দিয়ে,
এমন করিয়া রাঙায়েছে যেন ফুলেরা উঠেছে জিয়ে।
একপাশে আছে ফুলচাং বাঁধা নানা কারুকাজ ভরা,
চাল ভালো কিবা ফুলচাং ভালো বলা যায়নাক ত্বরা।
তার সাথে বাঁধা কেলী-কদম্ব ঝুনঝুনি-শিকা আর,
আসমান তারা-শিকার রঙেতে সব রঙ মানে হার।
শিকায় ঝুলাল চীনের বাসন, নানান রঙের শিশি,
বাতাসের সাথে হেলিছে দুলিছে রঙে রঙ দিবানিশি।
তাহার নীচেতে মাদুর বিছায়ে মেয়েটি বসিয়া একা,
রঙিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে রচিছে ফুলের লেখা।

মাথার উপরে আটনে ছাটনে বেতের নানান কাজ,
ফুলচাং আর শিকাগুলি ভরি দুলিতেছে নানা সাজ।
বনের শাখায় পাখিদের গান, উঠানে লতার ঝাড়,
সবগুলো মিলে নির্জনে যেন মহিমা রচিছে তার।
মেয়েটি কিন্তু জানে না এসব শিকার তুলিছে ফুল,
অতি মিহি-সুরে গান সে গাহিছে মাঝে মাঝে করি ভুল।
বিদেশী তাহার স্বামীর সহিত গভীর রাতের কালে,
পাশা খেলাইতে ভানুর নয়ন জড়াল ঘুমের জালে:
ঘুমের ঢোলনি, ঘুমের ভোলনি—সকলে ধরিয়া তায়,
পাল্কির মাঝে বসাইয়া দিয়া পাঠাল স্বামীর গাঁয়।
ঘুমে ঢুলু আঁখি, পাল্কি দোলায় চৈতন হলো তার,
চৈতন হয়ে দেখে সে ত আজ নহে কাছে বাপ-মার!
এত দরদের মা-ধন ভানুর কোথায় রহিল হায়,
মহিষ মানত করিত তাহার কাঁটা যে ফুটিলে পায়।
হাতের কাঁকনে আঁচড় লাগিলে যেত যে সোনারু বাড়ি,
এমন বাপেরে কোন দেশে ভানু আসিয়াছে আজ ছাড়ি।
কোথা সোহাগের ভাই-বউ তার মেহেদি মুছিলে হায়,
আপন সিঁথার সিঁদুর চাহিত ঘষিতে ভানুর পায়।
কোথা আদরের মৈফল-ভাই ভানুর আঁচল ছাড়ি,
কী করে আজিকে দিবস কাটিছে একা খেলাঘরে তারি!

এমনি করিয়া বিনায়ে বিনায়ে মেয়েটি করিছে গান,
দূর বন-পথে 'বৌ-কথা-কও' পাখি ডেকে হয়রান।
সেই ডাক আরো নিকটে আসিল, পাশের ধঞ্চে খেতে,
তারপর এল তেঁতুলতলায় কুটিরের কিনারেতে।
মেয়েটি খানিক শিকা তোলা রাখি অধরেতে হাসি আঁকি,
পাখিটিরে সে যে রাগাইয়া দিল বউ-কথা-কও ডাকি।
তারপর শেষে আগের মতোই শিকায় বসায় মন,
ঘরের বেড়ার অতি কাছাকাছি পাখি ডাকে ঘন ঘন;
এবার সে হলো আরো মনোযোগী, শিকা তোলা ছাড়া আর
তার কাছে আজ লোপ পেয়ে গেছে সব কিছু দুনিয়ার:
দোরের নিকট ডাকিল এবার বউ-কথা-কও পাখি,
'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও', বারেক ফিরাও আঁখি।
বউ মিটি মিটি হাসে আর তার শিকায় যে ফুল তোলে,
মুখপোড়া পাখি এবার তাহার কানে কানে কথা বলে।

'যাও—ছাড়ো—লাগে,' 'এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।
হয়ত এমনি পাখির মতন এ-ডাল ও-ডাল করি,
'বউ কথা কও' ডাকিয়া ডাকিয়া জনম যাইবে হরি।
হতভাগা পাখি! সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া পাবে না কূল,
মুখপোড়া বউ সারাদিন বসি শিকায় তুলিবে ফুল।'
'ইস্যিরে মোর কথার নাগর! বলি ও কী করা হয়,
এখুনি আবার কুঠার নিলে যে, বসিতে মন না লয়?'
'তুমি এইবার ভাত বাড়ো মোর, একটু খানিক পরে,
চেলা কাঠগুলো ফাড়িয়া এখনি আসিতেছি ঝট করে।'
'কখনো হবে না আগে তুমি বসো' বউটি তখন উঠি,
ডালায় করিয়া হুড়ুমের মোয়া লইয়া আসিল ছুটি।
একপাশে দিল তিলের পাটালি, নারিকেল লাড়ু আর,
ফুললতা আঁকা ক্ষীরের তক্তি দিল তারে খাইবার,
কাঁসার গেলাসে ভরে দিল জল, মাজা-ঘষা ঝরঝরে,
ঘরের যা কিছু মুখ দেখে বুঝি তার মাঝে ছায়া পড়ে।
হাতেতে লইয়া ময়ূরের পাখা বউটি বসিয়া পাশে,
বলিল, 'এসব সাজায়ে রাখিনু কোন দেবতার আশে?'

'তুমিও এসো না!' 'হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের সনে,
খাইতে বসিয়া জাত খোয়াইব, তাই ভাবিয়াছ মনে?'
'নিজেরি জাতটা খোয়াই তাহলে' বড়ো গম্ভীর হয়ে,
টপ টপ করে যা ছিল ভোজন পুরিল অধরালয়ে।

বউ ততখনে কলিকার পরে ঘন ঘন ফুঁক পাড়ি,
ফুলকি আগুন ছড়াইতেছিল দুটি ঠোঁট গোল করি'
দু-এক টুকরো ওড়া ছাই এসে লাগছিল চোখে মুখে,
ঘটছিল সেথা রূপান্তর সে বুঝি না দুখে কী সুখে।
ফুঁক দিতে দিতে দুটি গাল তার উঠেছিল ফুলে ফুলে,
ছেলেটি সেদিকে চেয়ে চেয়ে তার হাতধোয়া গেল ভুলে।
মেয়েটি এবার টের পেয়ে গেছে, কলকে মাটিতে রাখি,
ফিরিয়া বসিল ছেলেটির পানে ঘুরায়ে দুইটি আঁখি।

তারপর শেষে শিকা হাতে লয়ে বুনাতে বসিল ত্বরা,
মেলি বাম পাশে দুটি পাও তাতে মেহেদির রঙ ভরা।
নীলাম্বরীর নীল সায়রেতে রক্তকমল দু'টি,
প্রথম ভোরের বাতাস পাইয়া এমনি উঠেছে ফুটি।
ছেলেটি সেদিকে অনিমেষ চেয়ে, মেয়েটি পাইয়া টের,
শাড়ির আঁচলে চরণ দুইটি ঢাকিয়া লইল ফের।

ছেলেটি এবার ব্যস্ত হইয়া কুঠার লইল করে,
এখনি সে যেন ছুটিয়া যাইবে চেলা ফাঁড়িবার তরে।
বউটি তখন পা-র আবরণ একটু লইল খুলি,
কী যেন খুঁজিতে ছেলেটি আসিয়া বসিল আবার ভুলি!
এবার বউটি ঢাকিল দুপাও শাড়ির আঁচল দিয়ে,
ছেলেটি সজোরে কল্কে রাখিয়া টানিল হুঁকোটি নিয়ে!
'খালি দিনরাত শিকা ভাঙাইবে? হুঁকোয় ভরেছ জল?
কটুর মতন গন্ধ ইহার একেবারে অবিকল!'
'এক্ষুনি জল ভরিনু হুঁকায়!' 'দেখো! রাগায়ো না মোরে,
নৈচা আজিকে শিক পুড়াইয়া দিয়েছিলে সাফ করে?
কটর কটর শব্দ না যেন মৃত্যু হতেছে মোর,
রান্নাঘরেতে কেন এ দুপুরে দিয়ে দাও নাই দোর?

এখনি খুলিলে? কথায় কথায় কথা কর কাটাকাটি,
রাগি যদি তবে টের পেয়ে যাবে বলিয়া দিলাম খাঁটি।'

'মিছেমিছি যদি রাগিতেই শখ, বেশ রাগ করো তবে,
আমার কী তাতে, তোমারি চক্ষু রক্তবরন হবে।'
'রাগিবই তবে? আচ্ছা দাঁড়াও মজাটা দেখিয়া লও,
যখন তখন ইচ্ছামাফিক যা খুশি আমারে কও!
এইবার দেখো! না! না! তবে আর রাগিয়া কী মোর হবে,
আমি ত তোমার কেউকেটা নই খবর টবর লবে?'

বউটি বসিয়া শিকা ভাঙাইছে, আর হাসিতেছে খালি ;
প্রতিদিন সে ত বহুবার শোনে এমনি মিষ্টি গালি।
'ও বীর পুরুষ জানা গেছে আজ খুব পারো রাগিবারে,
বেড়ার পানেতে চেয়ে দেখো দেখি, কী এঁকেছি এইধারে।
এই আঁকিয়াছি দুর্গা 'ভবানী' গণেশ এঁকেছি এই!
একা গেঁয়ো ঘরে রাধা বসে আছে কৃষ্ণ ত কাছে নেই!'
'কেন কাছে নেই?' 'বোকা কোথাকার, তাহাও বলিতে হবে'?
কৃষ্ণ যে বনে কাঠ-কাটিবারে গিয়েছিল সেই কবে?'
'আচ্ছা এ বেটা ষাঁড়ের উপরে, কী নাম হইবে এর?'
'তুচ্ছ কোরো না ; এটা মহাদেব, রাগাইলে পাবে টের।
কৃষ্ণ চলেছে মথুরার পথে, এই রহিয়াছে আঁকা,
আর এই দেখো, রাবণ রাজার ঘুরিছে রথের চাকা।
ভেলায় ভাসিয়া বেহুলা চলেছে লখাই লইয়া কোলে,
সিঁথার সিঁদুর ভেসে গেছে তার গংকিনী নদী-জলে।'
শাড়ির আঁচলে দুটি চোখ মুছি দুলী কহে 'এইখানে,
জনমদুখিনী সীতা বসে আছে চেয়ে দেখ তার পানে।
রাজারানী আজ পথের কাঙালী বনবাস দিয়ে তারে,
অযোধ্যাপুরী যেতে লক্ষ্মণ ফিরে চায় বারে বারে।
হারে অভাগীর কত না বেদনা, ঘাটে ঘাটে ঢেউ হানি,
দুখানি তীরের গলা জড়াইয়া কাঁদিছে গাঙের পানি,
ও কী চোখে জল, এইখানে দেখো জগন্নাথের পুরী।
বৃন্দাবনের মন্দির দেখো ডাইনে একটু ঘুরি।'

'সব ত আঁকিলে' সোজন কহিল, 'মুসলমানের পীর,
যদি রাগ করে? কিছু আঁক নাই তাঁহাদের কাহিনীর?'
'চোখে কি তোমার ঢেলা ঢুকিয়াছে? চেয়ে দেখো এইধারে,
মক্কার ঘর দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রণাম জানাও তারে!
এইখানে দেখো ধূ ধূ বালু উড়ে কারবালা ময়দান,
ফোরাতের কূলে ঢুলিয়া পড়েছে গোধূলির আসমান।
এইধারে এই হোসেনের তাঁবু, পতির মরণ জানি,
সকিনা তাহার বিবাহের বেশ ছিঁড়িতেছে টানি টানি।
জল! জল! করি কাঁদে পরিজন, অভাগা হোসেন হায়,
নিজের বক্ষ নিজে আঁচড়িছে, জল যদি কোথা পায়।
এইখানে দেখো, পাহাড়ের তলে শিরী-ফরহাদ শুয়ে,
বনের গাছটি শাখা দুলাইছে কবরে তাদের নুয়ে।
হেথায় এঁকেছি ডালিমের গাছ তাহারই শীতল ছায়,
অভাগী মজনু লায়লীরে লয়ে কবরেতে ঘুম যায়।
আর এইখানে আঁকিয়া রেখেছি শিমুলতলীর গাঁও,
আমাদের গাঁর মসজিদ এই, সামনের দিকে চাও।
দূর ছাই, আমি এ কী করিতেছি! বেলা যে পড়েছে ঢলি,
লক্ষ্মীটি তুমি তেল মাখে দিয়ে সিনানেতে যাও চলি।'
ছেলেটি তখন লক্ষ্মীর মতো চলিল সিনান তরে,
বউটি উঠিয়া অতি ধীরে ধীরে ঢুকিল রান্নাঘরে।

কাঠের বোঝাটি মাথায় করিয়া সোজন কহিল, 'যাই?'
'আনিতে কিন্তু ভুলিও না তুমি, যাহা বলিয়াছি তাই।'
খানিক যাইয়া ফিরিল সোজন, কহিল বউরে ডাকি,
'আমাগো বাড়ির উনির তরেতে সিঁদুর আনিব নাকি?'
'আমাগো বাড়ির উনির কি আজ বে-ভুল হয়েছে মন,
কাল ত এনেছে সিঁতার সিঁদুর মনে নাই এক্ষণ
সুন্দা ও মেথি আনে যেন আজ, কাঞ্চা হলুদ আর,
খয়েরের কথা বলিয়া বলিয়া এখন মেনেছি হার।'
'আনিব, আনিব' এবার সোজন গিয়েছে একটু দূরে,
বউ বলে 'উনি বারেক ফিরিয়া চাহক একটু ঘুরে,
লঙ্গ, এলাচি, দারচিনি আর সেন-সেন না কি কয়,
খানিক খানিক কিনে আনে যেন পয়সায় যদি হয়।'

'সেদিন আনিনু ইহারি মধ্যে ফেলিয়াছ সব খেয়ে!'
'আমাগো বাড়ির উনি বুঝি তাই দেখিয়াছে চেয়ে চেয়ে?
কর্তারি রোজ আধমণ লাগে, আর শোনো এক কথা,
শহরেতে শুনি শাড়ির নাকি গো নাম যে কলমিলতা;
বালুচর-শাড়ি, জলে-ভাসা শাড়ি, কেলী-কদম্ব শাড়ি,
গোলাপ ফুল যে শাড়িতে নাকি গো গোলাপ ফুলের বাড়ি।
ও সবে আমার নাই কোনো লোভ, কলমিলতা যে নাম,
আমার বড়ই হাউস হয়েছে পেলে তাই পরিতাম!'
'এই কথা তুমি আগে বল নাই? পাট বেচি দুইমণ,
ওই শাড়ি যদি নাহি কিনি আমি, দেখে নিও তক্ষণ!
এখন তাহলে হাটে যাই আমি, গরুটাকে বেঁধো ঘরে,
সন্ধ্যা হলেই কুটিরে ঢুকিও দ্বার যে বন্ধ করে!'
'আর শোনো কথা, দেরি যেন আজ হয় নাকো কোনো মতে,
যাও, তুমি মোরে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিছ ওখান হতে।'
এমনি নানান সুখের সলিলে হাসে তাহাদের দিন,
তরঙ্গে তারি ভাসিয়া গিয়াছে অতীতের যত চিন।

সামনের ওই কানন হইতে কাটিয়া আনিয়া কাঠ,
প্রতি সোমবারে করে যে সোজন মধুমালতীর হাট।
ঘরেতে দুলালী লাকড়ি কাটিয়া ছোটো ছোটো আঁটি বাঁধে,
আর মাঝে মাঝে নানান সেলাই করে সে মনের সাধে।
ধারেকাছে কারো বাড়ি নাই কোনো, নদীর জলের পরে,
ভাটি ও উজান নাও বেয়ে যায় মাঝিরা পালের ভরে।
মাঝে মাঝে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে উদাস হইয়া শোনে,
বাঁশির মতন কণ্ঠ বাজিছে একটি ঘরের কোণে।

আঠারো

আগে জানি নাইরে দয়াল এমন হবে রে—
আগে জানি নাইরে দয়াল পরান যাবে রে।
আগে না জেনে পিছে না শুনে প্রেম যে জন করে,
ঘসীর অনল তুষের ধুঁয়া সদায় জ্বইলা উঠে রে;

—আমি আগে জানি নাই।
পিরিতি আটন পিরিতি ছাটন পিরিতির দুখানা চলে,
পিরিতির ঘরে কপাট দিয়ে আমি রইব কত কাল রে,
—আমি আগে জানি নাই।
আঙুল কাটিয়া কলম বানাইলাম চক্ষে জল কালি
পাঁজর কাটিয়া লেখন লেখিয়া পাঠাই বন্ধুর বাড়ি রে,
—আমি আগে জানি নাই।

—মুর্শিদা গান

মধুমতী নদী দিয়া

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে কূলে ঢেউ আছাড়িয়া।
জলের উপরে ভাসাইয়া তারা ঘর বাড়ি সংসার,
নিজেরাও আজ ভাসিয়া চলেছে সঙ্গ লইয়া তার।
মাটির ছেলেরা অভিমানভরে ছাড়িয়া মায়ের কোল,
নাম-হীন কত নদীতরঙ্গে ফিরিছে খাইয়া দোল।
দুপাশে বাড়ায়ে বাকা তট-বাহু সাথে সাথে মাটি ধায়,
চঞ্চল ছেলে আজিও তাহারে ধরা নাহি দিল হায়!
কত বন-পথ সুশীতল ছায়া, ফুল-ফল ভরা গ্রাম,
শস্যের খেত আলপনা আঁকি ডাকে তারে অবিরাম।
কত ধল-দীঘি, গাজনের হাট, রাঙামাটি পথে ওড়ে;
কারো মোহে ওরা ফিরিয়া এল না আবার মাটির ঘরে।

সোজন বাদিয়ার ঘাট

জলের উপরে ভাসায়ে উহারা ডিঙ্গি নায়ের পাড়া,
নদীতে নদীতে ঘুরিছে ফিরিছে সীমাহীন গতিহারা।
তারি সাথে সাথে ভাসিয়া চলেছে প্রেম ভালোবাসা মায়া,
চলেছে ভাসিয়া সোহাগ আদর, ধরিয়া ওদের ছায়া।
—জলের উপরে ভাসিয়া চলেছে কোলাহল, মারামারি।
ত্যাগের মহিমা পুণ্যের জয় সঙ্গে চলেছে তারি।

সামনের নায়ে বউটি দাড়ায়ে হাল ঘুরায়েছে জোরে
রঙিন পালের বাদাম তাহার বাতাসে গিয়াছে ভরে।
ছই-এর নীচে স্বামী বসে বসে লাঠিতে তুলিছে ফুল,
মুখেতে আসিয়া উড়িছে তাহার বাবরি মাথার চুল।

ও নায়ের মাঝে বউটিরে ধরে মারিতেছে তার পতি,
পাশের নায়েতে তাস খেলাইছে সুখে দুই দম্পতি।
এ নায়ে বেঁধেছে কুরুক্ষেত্র বউ-শাশুড়ীর রণে,
ও নায়ে স্বামীটি কানে কানে কথা কহিছে জায়ার সনে,
ডাক ডাকিতেছে, ঘুঘু ডাকিতেছে, কোড়া করিতেছে রব
হাট যেন জলে ভাসিয়া চলেছে মিলি কোলাহল সব।
জলের উপরে কেবা একখানা নতুন জগৎ গড়ে,
টানিয়া ফিরিছে যেথায় সেথায় মনের খুশির ভরে।

কোনো কোনো নায়ে রোদে শুখাইছে ছেঁড়া কাথা কয়খানা
আর কোনো নায়ে শাড়ি উড়িতেছে বরন দোলায়ে নানা।
ও নাও হইতে শুঁটকি মাছের গন্ধ আসিছে ভাসি,
এ নায়ের বধূ সুন্দা ও মেথি বাটিতেছে হাসি হাসি।

কোনোখানে ওরা স্থির নাহি রহে, জ্বালাতে সন্ধ্যাদীপ,
একঘাট হতে আর ঘাটে যেয়ে দোলায় সোনার টিপ।
এদের গাঁয়ের কোনো নাম নাই, চারি সীমা নাহি তার,
উপরে আকাশ, নীচে জলধারা, শেষ নাহি কোথা কার।
পড়শি ওদের সূর্য, তারকা, গ্রহ ও চন্দ্র আদি,
তাহাদের সাথে ভাব করে ওরা চলিয়াছে দল বাঁধি;
জলের হাঙর—জলের কুমির—জলের মাছের সনে,
রাতের বেলায় ঘুমায় উহারা ডিঙ্গি নায়ের কোণে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে মধুমতী নদী দিয়া,
বেলোয়াড়ি চুরি, রঙিন খেলনা, চিনে সিন্দুর নিয়া;
ময়ূরের পাখা, ঝিনুকের মতি, নানান পুঁতির মালা,
তরীতে তরীতে সাজানো রয়েছে ভরিয়া বেদের ডালা।
নায়ে নায়ে ডাকে মোরগ-মুরগী যত পাখি পোষা-মানা,
শিকারী কুকুর রহিয়াছে বাঁধা আর ছাগলের ছানা।
এ নায়ে কাঁদিছে শিশু মার কোলে—ও নায়ে চালার তলে,
গুটি তিনচার ছেলেমেয়ে মিলি খেলা করে কুতূহলে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে, ছেলেরা দাঁড়ায়ে তীরে,
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিছে জলের এ ধরণীরে।
হাত বাড়াইয়া কেহ বা ডাকিছে—কেহ বা ছড়ার সুরে,
দুইখানি তীর মুখর করিয়া নাচিতেছে ঘুরে ঘুরে।

চলিল বেদের নাও,
কাজলকুঠির বন্দর ছাড়ি ধরিল উজানী গাঁও
গোদাগাড়ি তারা পারাইয়া গেল, পারাইল বউঘাটা,
লোহাজুড়ি গাঁও দক্ষিণে ফেলি আসিল দরমাহাটা ;
তারপর আসি নাও লাগাইল উড়ানখালির চরে,
রাতের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে তখন মাথার পরে।

ধীরে অতি ধীরে প্রতি নাও হতে নিবিল প্রদীপগুলি,
মৃদু হতে আরো মৃদুতর হলো কোলাহল ঘুমে ঢুলি।
কাঁচা বয়সের বেদে-বেদেনীর ফিস ফিস কথা কওয়া,
এ-নায়ে ও-নায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুনিছে রাতের হাওয়া।
তাহাও এখন থামিয়া গিয়াছে, চাঁদের কলসি ভরে,
জোছনার জল গড়ায়ে পড়িছে সকল ধরণী পরে।
আকাশের পটে এখানে সেখানে আবছা মেঘের রাশি,
চাঁদের আলোরে মাজিয়া মাজিয়া চলেছে বাতাসে ভাসি।
দূর গাঁও হতে রহিয়া রহিয়া ডাকে পিউ পিউ কাহা,
যোজন যোজন আকাশ ধরায় রচিয়া সুরের রাহা।

এমন সময় বেদে নাও হতে বাজিয়া বাঁশের বাঁশি,
সারা বালুচরে গড়াগড়ি দিয়ে বাতাসে চলিল ভাসি ;
কতক তাহার নদীতে লুটাল, কতক বাতাস বেয়ে,
জোছনার রথে সোয়ার হইয়া মেঘেতে লাগিল যেয়ে।
সেই সুর যেন সারে জাহানের দুঃসহ ব্যথা-ভার,
খোদার আরস কুরছি ধরিয়া কেঁদে ফেরে বারবার।
সেই বাঁশি বাজে, নিঠুর আমারে সোঁতের শেহলা করি,
আর কতদূরে ভাসাইয়া নিবে ভাটিয়াল নদী ধরি।
যাহার তরেতে বাদিয়ার ঝালী বয়ে ফিরি দেশে দেশে,
আজো সে আমাতে নারে দেখা দিল, কথা না কহিল এসে।

উড়িয়া যাওরে পঙ্খি—অনেক অনেক দূরেতে যাও,
অভাগিনী দুলী কোন দেশে থাকে দেখিতে কি তারে পাও?
যদি দেখে থাক, কহিও—এখনো মরেনি এ হতভাগা,
আজো গাঙে গাঙে ভেসে ফেরে সে যে লইয়া বুকের দাগা।

উঞ্চল ডালে থাকোরে পঙ্খি—নজর বহুত দূর,
হয়তো বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণবন্ধুর।
যদি জান তবে এনে দাও তারে দেরির সময় নাই,
মাটির প্রদীপ করে নিবু নিবু, বড়ো ভয় লাগে তাই!
জনমের দেখা দেখিব তাহারে, তারপর কেহ আর,
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় জানিবে না সমাচার।
আমার বুকের মালারে পঙ্খি, দোলে বেগানার গলে,
কী আশায় তবে বাঁচিয়া থাকিব, মোরে যাও তুমি বলে!

ভাটি বেয়ে তুমি যাও ওরে নদী! শুনি ভাটিয়াল সুর,
হয়তো বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণবন্ধুর।
মোরে তবে নদী সেই দেশে আজ ভাসাইয়া নিয়ে যাও,
জীবনের শেষ নিঃশ্বাস লব দুশিয়া তারি গাঁও।
তাহারি কাঁখের কলসিতে শুনি জলভরনের গান,
বড়ো সুখে আমি করিব রে নদী জীবনের অবসান।
সেই কূল তুমি ভাঙিছ রে নদী, যে কূলেতে কর বাস,
তোমার নিকটে শিখেছে বন্ধু এই রীতি বারো মাস।
আগে যদি আমি জানতাম নদী, পীরিতির এত জ্বালা,
নারে যাইতাম কদম্বতলে, নারে গাঁথিতাম মালা।
ঘসীর অনল রহিয়া রহিয়া ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে,
দেহ পুড়ে যায়, হারে অভাগার পরান নাহিকো ছোটে।

নদীরে! তোমার বুকে ঢেউ দিলে কূলেতে আঘাত লাগে,
বুকের ব্যথার দোসর নাহিক আপনারে শুধু দাগে।
বন পুড়ে গেল সব লোকে দেখে, মনের অনল যার
দ্বিগুণ জ্বলিছে, তবু কেহ তার জানেনাক সমাচার।
এমনি করিয়া বাঁশির সুরেতে আকাশ বাতাস বুঝি,
বিনায়ে বিনায়ে অঝোরে কাঁদিছে আপন ব্যথারে খুঁজি।

যোজন জুড়িয়া সাদা বালুচর—জোছনা কাফন গায়ে,
ধূলার নিশাসে কাঁপিয়া উঠিছে শেষ রাত্রের বায়ে।

আমার বাড়ি

আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরী কলা,
গামছা বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।
চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব সুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি,
জড়িয়ে দেব বুকে।
গাই দোহনের শব্দ শুনি
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।
আমার বাড়ি ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দীঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি।
আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ,
মৌরি ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

পালের নাও

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
ঘরে আছে ছোটো বোনটি তারে নিয়ে যাও।
কপিল-সারি গাইয়ের দুধ যেয়ো পান করে,
কৌটা ভরি সিঁদুর দেব কপালটি ভরে!
গুবার গায়ে ফুল চন্দন দেব ঘষে ঘষে,
মামা-বাড়ির বলব কথা—শুনো বসে বসে!

কে যাওরে পাল-ভরে কোন দেশে ঘর,
পাছা নায়ে বসে আছে কোন সওদাগর?
কোন দেশে কোন গাঁয়ে হিরে ফুল ঝরে,
কোন দেশে হিরামন পাখি বাস করে!
কোন দেশে রাজ-কনে, খালি ঘুম যায়,
ঘুম যায় আর হাসে হিম-সিম বায়!
সেই দেশে যাব আমি কিছু নাহি চাই,
ছোটো মোর বোনটিরে সাথে যদি পাই।

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
তোমার যে পালে নাচে ফুলঝুরি বাও।
তোমার যে নার ছই আবের ঢাকনি,
ঝলমল জ্বলিতেছে সোনার বাঁধুনি।
সোনার না' বাঁধনরে তার গোড়ে গোড়ে,
হিরামন পঙ্খির লাল পাখা ওড়ে।
তার পর ওড়েরে ঝালরের হাসি,
ঝলমল জলে জ্বলে রতনের রাশি।
এই নাও বেয়ে যায় কোন সওদাগর,
কয়ে যাও—কয়ে যাও, কোন দেশে ঘর?

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
ঘরে আছে ছোটো বোন তারে নিয়ে যাও।

যে না গাঙে সাঁতার করে গলাগলি,
সেথা বাস কুহেলির--লোকে গেছে বলি।
পারাপার দুই নদী—মাঝে বালুচর,
সেইখানে বাস করে চাঁদ-সওদাগর।
এপারে ভুতুমের বাসা ও-পারেতে টিয়া—
সেখানেতে যেয়োনারে নাওখানি নিয়া।
ভাইটাল গাঙ্ দোলে ভাটি গেঁয়ো সোঁতে,
হবে নারে নাও বাওয়া সেথা কোনোমতে।

বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়

রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ যখন হয়,
দুই নখেতে আঁধার চিরি বিজলি যখন জ্বলে ভুবনময় ;
তুফান ছোটে জোর দাপটে, বৃষ্টি পড়ে মেঘের ঝাঁজর ঝরে,
বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়—মুহূর্ত সে রইতে নারে ঘরে।
বিলের জলে টাইটুবানি রোহিত কাতল মাছেরা দেয় ফাল,
কই মাগুরের দল সাঁতারে আঁকাবাঁকা ধরি গাঁয়ের খাল ;

এমন সময় বছিরদ্দি একহাতেতে তীক্ষ্ণ টেঁটা ধরে,
আর এক হাতে মশাল জ্বালি বীর দাপটে ছোটে মাঠের পরে।
বুড়ির ভিটায় বেড়াল ডাকে, তাল-তলাতে গলায় দড়ি দিয়ে,
মরেছিল তাঁতির বধূ—এ সবে তার কাঁপায় নাকো হিয়ে।
শেওড়া বনে পেত্নী নাচে, হাজরাতলায় পিশাচে দেয় শিস,
বিলের ধারে আগুন জ্বালি ভূতেরা সব ফিরছে নানান দিশ্ ;
ভয় নাহি তার কারও কাছে, রাতের আঁধার মশাল দিয়ে ঠেলে,
একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দুখান ফেলে।
হাতে তাহার তীক্ষ্ণ টেঁটা, গায়ে তাহার মোষের মতো জোর,
চোখদুটিতে উল্কা জ্বলে যমদূতেরও দেখে লাগে ঘোর।

রাতদুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়—
দূর হতে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো ছায়।
বৃষ্টি-শিলা মাথায় পড়ে, তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মতো,
রয়ে রয়ে বিজলি জ্বলে ইন্দ্র ডাকে আঁধার করি ক্ষত;
শ্মশান-ঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচ দোলা খায়,
রাতদুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।

পলাতকা

হাসু বলে একটি খুকু আজ যে কোথা পালিয়ে গেছে—
না জানি কোন অজান দেশে কে তাহারে ভুলিয়ে নেছে;
বন হতে সে পালিয়ে গেছে, বনে কাঁদে বনের লতা,
ফুল ফুটে কয় সোনার খুকু! ছেড়ে গেলি মোদের কোথা?
বনের ছিল অপ্সরী সে, চলত পথে নূপুর পায়ে,
গাছের শাখা দুলিয়ে পাতা—করত বাতাস তাহার গায়ে।
তাহার শাড়ির আঁচল লাগি ঝুমকো লতা দুলত বনে,
গাছে গাছে ফুল নাচিত তাহার পদধ্বনির সনে।
বনের পথে ডাকত পাখি, তাদের সুরের ভঙ্গি করে—
কচি মুখের মিষ্টি ডাকে সারাটি বন ফেলত ভরে।
প্রতিধ্বনি তাহার সনে করত খেলা পালিয়ে দূরে,
সুরে সুরে খুঁজত সে তায় বনের পথে একলা ঘুরে।
সেই হাসু আজ পালিয়ে গেছে, পাখির ডাকের দোসর নাহি,
প্রতিধ্বনি আর ফেরে না তাহার সুরের নকল গাহি।

হাসু নামের একটি খুকু পালিয়ে গেছে অনেক দূরে,
কেউ জানে না কোথায় গেছে কোন বা দেশে কোন বা পুরে।
বাপ জানে না, মায় জানে না কোথায় সে যে পালিয়ে গেছে,
সেও জানে না, কোন সুদূরে কে তাহারে সঙ্গে নেছে।
কোনোখানে কেউ ভাবে না, কেউ কাঁদে না তাহার তরে,
কেউ চাহে না পথের পানে; কখন হাসু ফিরবে ঘরে।

মায় কাঁদে না, বাপ কাঁদে না, ভাই-বোনেরা কাঁদছে না তার,
খেলার সাথী কেউ জানে না, সে কখনো ফিরবে না আর।
ফিরবে না সে, ফিরবে নারে, খেলা-ঘরের ছায়ার তলে,
মিলবে না সে আর আসিয়া তার বয়সের শিশুর দলে।
পেয়ারা-ডালে দোলনা খালি, ইঁদুরে তার কাটছে রশি,
চড়ুই-ভাতির হাঁড়ির পরে কাক দুটি আজ ডাকছে বসি।
খেলনাগুলি ধূলায় পড়ে, হাত-ভাঙা কার, পা ভাঙা কার,
ঝুমঝুমিটি বেহাত হয়ে বাজছে হাতে যাহার তাহার।
এসব খবর কেউ জানে না, সে জানে না, কেমন করে
কখন যে সে পালিয়ে গেলে তাহার চিরজনম তরে।
জানে তাহার পুতুলগুলো অনাদরে ধূলায় লুটায়,
বুকে করে আর না চুমে, পুতুল-খেলার সেই ছোটো মায়।
মাতৃ-হারা মিনি-বিড়াল কেবা তাহার দুঃখ বুঝে,
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সে তার ছোট্ট মায়ের আঁচল খুঁজে।
খেলা-ঘর আজ পড়ছে ভেঙে, শিশু-কল-তানের সনে,
পুতুল বধূ আর সাজে না পুতুল-বরের বিয়ের কনে।

হাসু নামের সোনার খুকু আজ যে কোথা পালিয়ে গেছে,
সাত-সাগরের অপর পারে কে তাহারে ভুলিয়ে নেছে।
পালিয়ে গেছে সোনার হাসু :— খেলার সাথী আয়রে ভাই—
আজের মতো শেষ খেলাটি এইখানেতে খেলে যাই :
যেখানটিতে খেলেছিলাম 'ভাঁড়-কাটি' সঙ্গে নিয়ে,
সেইখানটি দে রুধে ভাই ময়না-কাঁটা পুতে দিয়ে।

গৌরী গিরির মেয়ে

হিমালয় হতে আসিলে নামিয়া তুষারবসন ত্যাজি,
হিমের স্বপন অঙ্গে মাখিয়া সাঁঝের বসনে সাজি।
হে গিরি-দুহিতা তোমার নয়নে অলকার মেঘগুলি,
প্রতি সন্ধ্যায় পরাইয়া যেত মায়া-কাজলের তুলি।

তুহিন তুষারে অঙ্গ মাজিতে দুগ্ধধবল কায়,
রবির কিরণ পিছলি পিছলি লুটাত হিমানী বায়!
রাঙা মাটি-পথে চলিতে চলিতে পথ যেন মমতায়,
আলতা রেখায় রঙিন হইয়া জড়াইত দুটি পায়।
অলকে তোমার পাহাড়ি-পবন ফুলের দেউল লুটি,
গন্ধের বাসা রচনা করিত সারা রাত ছুটি ছুটি।

গহিন গুহার কুহরে কুহরে কলকল্লোলে ঘুরি,
ঝরনা তোমার চরণ বিছাত মণি-মানিকের নুড়ি!
পাষাণের ভাষা শুনিতে যে তুমি ঝরনায় পাতি কান,
শুনিতে শুনিতে কোন অজানায় ভেসে যেত তব প্রাণ!
ঝরনার স্রোতে ভাসিয়া আসিত অলস সোনার ঘুম,
তোমার মায়াবী নয়নে বিছাত দূর স্বপনের চুম।
শিথিল দেহটি এলাইয়া দিয়া ঘন তুষারের গায়,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ঘুমেরে যে ঘুম পাড়াইতে নিরালায়!
তোমার দেহের বিম্ব আঁকিয়া আপন বুকের পরে,
পরতের পর পরত বিছাত তুষার রজনী ভরে।
তোমার ছায়ায় যত সে লুকাত, চাঁদের কুমার তত
তুষারপরত ভেদিয়া সেথায় একেলা উদয় হতো।
দূর গগনের সাত-ভাই-তারা শিয়রে বিছায়ে ছায়া,
পারুল বোনের নিশীথশয়নে জ্বালাত আলোর মায়া।
দিনরজনীর মোহনার সোঁতে শুক-তারকার তরী,
চলিতে চলিতে পথ ভুলে যেত ঘাটের বাঁধন স্মরি।
পূর্বতোরণে দাঁড়ায়ে প্রভাত ছুঁড়িত আবিরধূলি,
তোমার নয়ন হইতে ফেলিত ঘুমের কাজল তুলি।
কিশোর কুমার, প্রথম হেরিয়া তোমার কিশোরী কায়া,
মেঘে আর মেঘে বরনে বরনে মাখাত রঙের মায়া।
কী কুহকে ভুলে ওগো গিরিসুতা! এসেছ মরতে নামি,
কে তোমার লাগি পূজার দেউল সাজায়েছে দিবা-যামি!
হেথায় প্রখর মরীচি-মালীর জ্বলে হুতাশন জ্বালা,
দহনে তোমার শুকাবে নিমেষে বুকে মন্দারমালা।
মরতের জীব বৈকুণ্ঠের নাহি জানে সন্ধান,
ফুলের নেশায় ফুলেরে ছিঁড়িয়া ভেঙে করে শতখান।

রূপের পূজারী রূপেরে লইয়া জ্বালায় ভোগের চিতা,
প্রেমেরে করিয়া সেবাদাসী এরা রচে যে প্রেমের গীতা।
হাত বাড়ালেই হেথা পাওয়া যায়, তৃষ্ণারে বড়ো করি,
তপ-কৃশ-তনু গৈরিকবাসে জাগে নাকো বিভাবরী।
হেথা সমতল, জোয়ারের পানি একধারে হতে ভাসি,
আরধারে এসে গড়াইয়া পড়ে ছলকল-ধারে হাসি।
হেথায় কামনা সহজ লভ্য, পরিয়া যোগীর বাস,
গহন গুহায় যোগাসনে কেউ করে না কাহারো আশ।
হেথাকার লোক খোলা চিঠি পড়ে, বন-রহস্য আঁকি,
বঙ্কুর পথে চলে না তটিনী কারো নাম ডাকি ডাকি।
তুমি ফিরে যাও হে গিরি-দুহিতা, তোমার পাষাণপুরে,
তোমারে খুঁজিয়া কাঁদিছে ঝরনা কুহরে কুহরে ঘুরে।
তব মহাদেব যুগ যুগ ধরি ভস্ম লেপিয়া গায়,
গহন গুহায় তোমার লাগিয়া রয়েছে তপস্যায়।
অলকার মেয়ে! ফিরে যাও তুমি, তোমার ভবন-দ্বারে,
চিত্রকূটের লেখন বহিয়া ফেরে মেঘ জলধারে।
তোমার লাগিয়া বিরহী যক্ষ গিরি-দরী পথ-কোণে
পাষাণের গায়ে আপন ব্যথারে মর্দিছে আনমনে ;
শোকে কৃশতনু, বিহ্বল মন, মৃণালবাহুরে ছাড়ি,
যার বার করে ভ্রষ্ট হইছে স্বর্ণ-বলয় তারি।
বাণীর কুঞ্জে ময়ূরময়ূরী ভিড়ায়েছে পাখা তরী,
দর্ভ-কুমারী, নিবারের বনে তৃণ আছে বিস্মরি।

তুমি ফিরে যাও তব অলকায়, গৌরী গিরির শিরে,
চরণে চরণে তুষার ভাঙিও মন্দাকিনীর তীরে।
কণ্ঠে পরিও কিংশুকমালা, পাটল-পুষ্প কানে,
নীপ-কেশরের রচিও কবরী নব আষাঢ়ের গানে।
তীর্থ পথিক বহু পথ বহি শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
কোনো এক প্রাতে যেয়ে পৌঁছিব 'শিলঙ' গিরিছায়।
দিগজোড়া ঘন কুয়াশার লোল অঞ্চলখানি,
বায়ুরথে বসি কিরণকুমার ফিরিবে সুদূরে টানি।
আমরা হাজার নরনারী হেথা রহিব প্রতীক্ষায়,
কোনো শুভখনে গিরি-কন্যার ছায়া যদি দেখা যায়।

দিবসের পর দিবস কাটিবে, মহাশূন্যের পথে,
বরষের পর বরষ ঢালিবে উতল মেঘের রথে।
কুহকী প্রকৃতি মেঘের গুচ্ছে বাঁধিয়া বাদলঝড়,
ঘন ঘোর রাতে মহাউল্লাসে নাচিবে মাথার পর।
ভয়-বিহ্বল দিবস লুকাবে কপিল মেঘের বনে,
খর বিদ্যুৎ অস্ত্র হাসিবে গগনের প্রাঙ্গণে।
তীর্থ-পথিক তবু ফিরিবে না, কোনো শুভদিন ধরি,
বহুদূর পথে দাঁড়াবে আসিয়া গৌরী গিরির পরী।
সোনার অঙ্গে জড়ায়ে জড়ায়ে বিজলির লতাগুলি,
ফুল ফোটাইবে, হাসি ছড়াইবে অধর দোলায় দুলি।
কেউ বা দেখিবে, কেউ দেখিবে না, অনন্ত মেঘ পরে,
আলোক প্রদীপ ভাসিয়া যাইবে শুধু ক্ষণিকের তরে।
তারপর সেথা ঘন কুয়াশার অনন্ত আঁধিয়ার,
আকাশ-ধরণী, বন-প্রান্তর করে দেবে একাকার।

আমরা মানুষ—ঘরের মানুষ—এই আমাদের মন,
যদি কোনোদিন পরিতে না চাহে কুটিরের বন্ধন;
যদি কোনোদিন সুদূর হইতে আলেয়ার আলো-পরী,
বেঘুম শয়ন করে চঞ্চল ডাকি মোর নাম ধরি।
হয়তো সেদিন বাহির হইব, গৃহের তুলসী তলে,
যে প্রদীপ জ্বলে তাহারে সেদিন নিবায়ে যাইব চলে।
অঙ্গে পরিব গৈরিক বাস, গলায় অক্ষহার,
নয়নে পরিব উদাস চাহনি মায়া মেঘ-বলাকার।
কাশীশ্বরের চরণ ছুঁইয়া পূতপবিত্র কায়,
জীবনের যত পাপ মুছে যাব প্রয়াগের পথ গায়।
হরিদ্বারের রঙিন ধূলায় ঘুমায়ে শ্রান্ত কায়,
ত্রিগঙ্গা জলে সিনান করিয়া জুড়াইব আপনায়।
কমণ্ডলুতে ভরিয়া লইব তীর্থনদীর বারি,
লছমন ঝোলা পার হয়ে যাব পূজা-গান উচ্চারি।
তাপসীজনের অঙ্গের বয়ে পবিত্র পথছায়ে,
বিশ্রাম লভি সমুখের পানে ছুটে যাব পায়ে পায়ে।
দেউলে দেউলে রাখিব প্রণাম, তীর্থনদীর জলে
পূজার প্রসূন ভাসাইয়া দিব মোর দেবতারে বলে।

মাস-বৎসর কাটিয়া যাইব, কেদারবদরী ছাড়ি,
ঘন বন্ধুর পথে চলিয়াছে সন্ন্যাসী সারি সারি,
কঠোর তাপেতে খিন্ন শরীর শ্রান্তক্লান্ত কায়,
সমুখের পানে ছুটে চলে কোন দুরন্ত তৃষ্ণায়।

সহসা একদা মানস সরের বেড়িয়া কনকতীর,
হোমের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে হাজার সন্ন্যাসীর।
শিখায় শিখায় লিখন লিখিয়া পাঠাবে শূন্যপানে,
মন্ত্রে মন্ত্রে ছড়াবে কামনা মহা-ওংকার গানে।
তারি ঝংকারে স্বর্গ হইতে বাহিয়া কনকরথ,
হৈমবতী গো, নামিয়া আসিও ধরি মর্ত্যের পথ।
নীল কুবলয় হস্তে ধরিও দাঁড়ায়ে সরসীনীরে,
মরাল-মরালী পাখার আড়াল রচিবে তোমার শিরে।
প্রথম উদিতা-উষসী-জবার কুসুমমুরতি ধরি,
গলিত হিরণ কিরণে নাহিও, হে গিরিদুহিতা পরী।
অধর ডলিয়া রক্তমৃণালে মুছিও বলাকাপাখে,
অঙ্গ ঘেরিয়া লাবণ্য যেন লীলাতরঙ্গ আঁকে।
চারিধার হতে ভকত কণ্ঠে উঠিবে পূজার গান,
তাঁর সিঁড়ি বেয়ে স্বরগের পথে করো তুমি অভিযান।

তীর্থ-পথিক, ফিরিয়া আসিব আবার মাটির ঘরে,
গিরিগৌরীর কাহিনী আনিব কমণ্ডলুতে ভরে।
দেউলে দেউলে গড়িব প্রতিমা, পূজার প্রসূন করে,
জনমে জনমে দেখা যেন পাই প্রণমিব ইষ্ট স্মরে।

অনুরোধ

তুমি কি আমার গানের সুরের
পূবালি বাতাস হবে,
তুমি কি আমার মনের বনের
বাঁশিটি হইয়া রবে!

রাঙা অধরের রামধনুটিরে,
ছড়াবে কি তুমি মোর মেঘ-নীড়ে,
আমি কি তোমার কবি হব রানী,
তুমি কি কবিতা হবে;
তুমি কি আমার মনের বনের
বাঁশিটি হইয়া রবে!

তুমি কি আমার মালার ফুলের
ফিরিবে গন্ধ হয়ে,
হাসিবে কি তুমি মোর কপালের
চন্দনফোঁটা হয়ে!
তুমি কি আমার নীলাকাশ পরে,
ফুটাবে কুসুম সারারাত ভরে,
সাঁঝ-সকালের রাঙা মেঘ ধরে
অঙ্গে জড়ায়ে লবে;
তুমি কি আমার মনের বনের
বাঁশিটি হইয়া রবে!

পদ্মাপার

(১)

ও বাবু সেলাম বারে বার,
ও বাবু সেলাম বারে বার,
আমার নাম গয়া বাইদ্যা বাবু,
বাড়ি পদ্মাপার।
মোরা পঙ্খি মারি পঙ্খি ধরি
মোরা পঙ্খি বেইচা খাই—
মোদের সুখের সীমা নাই,
সাপের মাথার মণি লয়ে মোরা
করি যে কারবার।

এক ঘাটেতে রান্ধি-বাড়ি
মোরা আরেক ঘাটে খাই,
মোদের বাড়ি ঘর নাই;
সব দুনিয়া বাড়ি মোদের
সকল মানুষ ভাই;
মোরা, সেই ভায়েরে তালাশ করি আজি
ফিরি দ্বারে দ্বার;
বাবু সেলাম বারে বার।

কে যাসরে রঙিলা মাঝি

কে যাসরে রঙিলা মাঝি। সামের আকাশরে দিয়া;
আমার বাজানরে বলিস খবর নাইওরের লাগিয়া রে।
অভাগিনীর বুকের নিশ্বাস পালে নাও ভরিয়া,
ছয়মাসের পথ যাইবা একদণ্ডে উড়িয়া;
গলুইতে লিখিলাম লেখন সিন্তার সিন্দুর দিয়া,
আমার বাপের দেশে দিয়া আইস গিয়া রে।

পরবাসে পাঠাইল বাজান যারে সঁইপা দিয়া,
সে যে শিশিরের গয়না দিল দূর্বাশিষে নিয়া;
কুয়াশার শাড়ি দিল বাতাসে ভরিয়া
অঙ্গে না পরিতে তাহা গেল যে উড়িয়া রে।
সাগরের ফেনায় পতি বানল বাসর-ঘর,
দুস্কের দাগাতে তাহা দাপায় জনমভর;
অবলা ভাঁড়াইল সে যে কাঞ্চাপিতল দিয়া,
এমন ঠকের ঘরে রহি কি করিয়া রে।

পরের ছেলের সঙ্গে বাজান আমায় দিল বিয়া,
জনমের মতো গেল বনবাস দিয়া;
একদিনের তরে আইসা না গ্যাল দেখিয়া,
এবার জুড়াইব মনের দুস্কু সায়রে ডুবিয়া রে।

সোনার বরনী কন্যা

সোনার বরনী কন্যা সাজে নানা রঙ্গে,
  কালো মেঘ যেন সাজিল রে।
সিনান করিতে কন্যা হেলে দুলে যায়,
নদীর ঘাটেতে এসে ইতি উতি চায়।
বাতাসে উড়িছে শাড়ি, ঘুরাইয়া চোখ,
শাসাইল তারে করি কৃত্রিম রোখ।
হলুদ মাখিয়া কন্যা নামে যমুনায়,
অঙ্গ হলুদ হইয়া জলে ভাইসা যায়।
ডুবাইয়া দেহ জলে থাকে চুপ করে,
জল ছুঁড়ে মারে কভু আকাশের পরে।
খাড়ু জলে নাইম্যা কন্যা খাড়ু মাঞ্জন করে,
আকাশের রামধনু হেলেদুলে পড়ে।

তারপরে বাহু দুটি মেরে জলাধারে,
ঘুরাইল ফিরাইল কত লীলাভরে।
বাহু দুটি মাজে কন্যা অতি কুতূহলে,
খসিয়া পড়িছে রূপ সোনালিয়া জলে।
অঞ্জলি পূরি জল অধরে ছুঁড়িছে,
জ্বলন্ত অঙ্গার হতে ফুলকি উড়িছে।
খুলিয়া কুন্তলভার ছড়াইল জলে,
আকাশ নামিল যেন সমুদ্দুরের কোলে।
দু-হাত বিঁধায়ে চুল যত মাঞ্জন করে,
মেঘেতে বিজলি যেন ফেরে লীলাভরে।
গলাজলে নেমে কন্যা গলা মাঞ্জন করে,
ঢেউগুলি টলমল মালার ফুলের তরে।
কর্ণফুলের ভূষণ লয়ে কোন ঢেউ ধায়,
নোলার কুসুম লোভে কেউ হাসে গায়।
সিনান করিয়া কন্যা উঠে জল হতে,
তরল লাবণিধারা ঝরে অঙ্গ স্রোতে।

খোসমানী

তেপান্তরের মাঠে রে ভাই, রোদ ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে
রে ভাই, রোদ ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে ;
দুল্‌ছে সদাই ধুলার দোলায় ঘূর্ণি হাওয়ার ভরে।
মাঝখানে তার বট-বিরিক্ষি ঠাণ্ডা পাতার বায়ে,
বাতাসেরে শীতল করে ছড়ায় মাটির গায়ে।
সেথায় আছে খোসমানী সে সোনার বরণ গা,
বিজলি-বরন হাত দুখানি আলতা-পরা পা।
সন্ধ্যাবেলা যখন এসে দাঁড়ায় প্রদীপ করে,
হাজার তারা ফুটে ওঠে নীল আকাশের পরে।

পাকা তেলাকুচের ফলে রাঙাতে ঠোঁট দুটি,
সন্ধ্যা-সকাল রাঙা হয়ে হাসে কুটিকুটি।
রামধনু, তার শাড়ির পাড়ে দোল খাইবে বলে,
সাতটি রঙের সাতটি হাসি ছড়ায় মেঘের দলে।
সাদা সাদা বকের ছানা নরম পাখা মেলে,
বলে, কন্যা, তোমার শাড়ির পাড়ে ফিরব খেলে।
মেঘের গায়ে বিজলি মেখে বলে, কন্যা, আয়!
তোরে আজি জড়িয়ে নেব নীলাম্বরীর ছায়!
সে যখনে হাসে তখন হাসে যে ফুলগুলি,
গান গাহিলে বেড়ে তারে নাচে যে বুলবুলি;
সকাল হলে দূর্বাশিষের নীহার-জলে নেয়ে,
আকাশ দিয়ে নেচে বেড়ায় ফুলের রেণু খেয়ে।
এই খুকিটির সঙ্গে তোমার আলাপ যদি থাকে,
বলো যেন আসমানীরে বারেক কাছে ডাকে।

আসমানী

আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও,
রহিমদ্দীর ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।

বাড়ি তো নয় পাখির বাসা—ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,
তারি তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে।

পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দেছে অনাহারে ক'দিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হতে হাসির প্রদীপ-রাশি
থাপড়েতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।
পরনে তার শতেক তালির শতেক ছেঁড়া বাস,
সোনালি তার গার বরণের করছে উপহাস।
ভোমর-কালো চোখদুটিতে নাই কৌতুক-হাসি,
সেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু রাশি রাশি।
বাঁশির মতো সুরটি গলায় ক্ষয় হলো তাই কেঁদে,
হয়নি সুযোগ লয় যে সে-সুর গানের সুরে বেঁধে।

আসমানীদের বাড়ির ধারে পদ্ম-পুকুর ভরে
ব্যাঙের ছানা শ্যাওলা-পানা কিল-বিল-বিল্ করে।
ম্যালেরিয়ার মশক সেথা বিষ গুলিছে জলে,
সেই জলেতে রান্না খাওয়া আসমানীদের চলে।
পেটটি তাহার দুলছে পিলেয়, নিতুই যে জ্বর তার,
বৈদ্য ডেকে ওষুধ করে পয়সা নাহি আর।
খোসমানী আর আসমানী যে রয় দুইটি দেশে,
কও তো যাদু, কারে নেবে অধিক ভালোবেসে?

পূর্ণিমা

পূর্ণিমাদের আবাস ছিল টেপাখোলার গাঁয়,
একধারে তার পদ্মানদী কলকলিয়ে যায়।
তিনধারেতে উধাও হাওয়া দুলত মাঠের কোলে,
তৃণফুলের গন্ধে কভু পড়ত ঢলে ঢলে।

সেখান দিয়ে পূর্ণিমারা ফিরত খেলে নিতি,
বাঁকাপথে বাজত তাদের মুখর পায়ের গীতি।
পদ্মানদীর মাঝিরে কেউ ডাকত ছড়ার সুরে,
শিশুমুখের কাকলিতে গ্রামটি যেত ভরে।
সেদিন হঠাৎ পত্র এলো বাবার থেকে তার,
পূর্ণিমারা কলকাতা আসবে শনিবার।
গীতা কানু সবাই খুশি, ফিস্‌ফিসিয়ে কয়,
ট্রামের গাড়ি, মোটর গাড়ি কলিকাতাময়।
গড়গড়িয়ে গড়ের মাঠে যখন তখন যাব,
ইলেকট্রিকের কল টিপিলে যা চাব তা পাব।
হাওড়া পুলের উপর দিয়ে আসব হাওয়া খেয়ে,
গঙ্গানদী করব উথল মস্ত জাহাজ বেয়ে।

এসব কথায় সবাই খুশি, তবু যাবার দিন
ঘনিয়ে যত আসছে, কোথায় বাজছে ব্যথার বীন।
বাবলা বনের যেখানটিতে হতো পুতুল বিয়ে,
পূর্ণিমা যে ঘুরে বেড়ায় সেইখানটি দিয়ে।
শিকের উপর দুলছে আজো খেলার হাঁড়িগুলি,
দাঁড়কাকটি বসে আছে সেথায় ঠোকর তুলি।
চড়ুইভাতির চুলোগুলি তেমনি আছে পড়ে,
এখানটিতে খেলবে না আর আগের মতন করে।
পোষা বিড়াল কেন যে তার সঙ্গ নাহি ছাড়ে,
যদি বুকে পিষছে তারে স্নেহের অত্যাচারে।

পূর্ণিমারা এসেছে আজ শহর কলিকাতা,
অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পেলেম তাদের পাতা।
শ্যামবাজারের বামধারেতে অন্ধগলির কোণে,
একতলা এক বন্ধ ঘরে থাকে অনেক জনে।
জানলা দিয়ে বয় না বাতাস, সারাটি ঘর ভরে,
ভ্যাঁপসামতো গন্ধে সদাই দম আটকে ধরে।
ভাই-বোনেতে ক'দিন আগে জলবসন্ত হতে
ভালো হয়ে উঠেছে আজ এই তো কোনোমতে।

চোখদুটি তার কোটরাগত, ফুলের মতো মুখে
হাসির প্রদীপ জ্বলে না আর শিশুকালের সুখে।

কোথায় তাহার খেলাঘরটি, কোথায় খোলা মাঠ!
বাবলাশাখায় বাতাস যেথায় করত ছড়া পাঠ।
বন্ধগলির অন্ধ কোণের কয়েকখানার ঘরে,
কোন দোষে সে বন্ধ হলো কোন অপরাধ করে?
কোন দস্যু করল হরণ আলো-বাতাস তার,
কে হরিল খেলার পুতুল নাচের নূপুর পার
কে হরিল ঝুনঝুনি তার শিশুহাতের থেকে,
উষার গায়ে কে দিল রে মেঘের কালি মেখে?

কোথায় আমার রাজার কুমার! শুয়ে মায়ের কোলে,
তোমার কি ঘুম ভাঙবে না এই শিশু-চোখের জলে।
শাস্ত্রী সিপাই লয়ে এসো সপ্তা-ডিঙা ভরে,
আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠুক জয়ডঙ্কার স্বরে।
ভাঙতে হবে বন্ধগলি, রুদ্ধ ঘরের দ্বার—
ভাঙতে হবে লক্ষযুগের অন্ধ কারাগার।

এমন নগর গড়বে তুমি সকল কোণেই তার,
সমান হয়ে উদাস বাতাস বইবে অনিবার।
চন্দ্র-রবির সোনার প্রদীপ জ্বলবে সবার ঘরে,
সকল ঘরের পূর্ণিমাদের হাসিমুখের তরে.
সেই আলো কেউ বন্ধ করে রাখতে যদি চায়,
তাহার সাথে যুদ্ধ মোদের সকল দুনিয়ায়!

দেশ

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলোমাথার কেশ.

সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঞ্চুতে জল ছিটায় সেথা কালো কালো কাক।
সাদা সাদা বক-কনেরা রচে সেথায় মালা,
শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা।
তারি মায়ায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া,
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।
সেই ফসলে আসমানীদের নেইকো অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি,
ডালের থেকে ডালের পরে ফিরছে পাখি টানি।
কচি কচি বনের পাতা কাঁপছে তারি সুরে,
ছোটো ছোটো রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে,
মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে,
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।
এই বনেতে আসমানীদের নেইকো অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে অনাহার।

নদীর পরে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ
কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না-জান দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়,
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ-নগর ছায়।
চখায় মুখর বালুর চরা হাসে কতই তীরে,
ফুলের বনে রঙিন হয়ে যায় বা কভু ধীরে :
কত মিনার-সৌধচূড়ার কোল ঘেঁষিয়া যায়,
কত শহর হাট-বন্দর-বাজার ফেলে বায়।
কত নায়ের ভাটিয়ালির গানে উদাস হয়ে,
নদীর পরে নদী চলে কোন অজানায় বয়ে।

সেই নদীতে আসমানীদের নেইক অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।

জলের কন্যা

জলের উপরে চলেছে জলের মেয়ে,
ভাঙিয়া টুটিয়া আছড়িয়া পড়ে ঢেউগুলি তটে যেয়ে।
জলের রঙের শাড়িতে তাহার জড়ায়ে জড়ায়ে ঘুরি,
মাতাল বাতাস অঙ্গের ঘ্রাণ ফিরিতেছে করিয়া চুরি।
কাজলে মেখেছে নতুন চরের সবুজ ধানের কায়া,
নয়নে ভরেছে ফটিকজলের গহন গভীর মায়া।
তাহার উপর ছায়া-চুরি খেলা করিতে তটের বন,
সুবাস ফুলের গন্ধ ছড়ায়ে হাসিতেছে সারাখন।

জলের কন্যা চলেছে জলের রথে,
খুশিতে ফুটিয়া শাপলা-পদ্ম হাসিতেছে পথে পথে।
আগে আগে চলে কলজলধারা ভাসায়ে পানার তরী,
চরণে তাহার আলতা পরাতে হিজল পড়িছে ঝরি।
ডাহক ডাহকী ডাকে বন-পথে নতুন পানির সুরে,
কোড়া আজ তার কুঁড়ীরে খুঁজিছে ঘন পাট-ক্ষেতে দূরে;
পুরাতন জালে তালি দিতে দিতে চলিয়া জেলের গায়,
জেলে বো'র মন সিহিসুরি গানে উজানীর বাঁকে ধায়।
পল্লীবধূরা উদাস নয়নে চেয়ে থাকে তটপানে,
বাপের বাড়ির মমতায় আজ পরান কেন যে টানে।
বাঙড়ের খালে সিনান করিতে কলসি ধরিয়া টানি,
মায়েরে কহিছে মেয়ের কথাটি নয়া-জোয়ারের পানি!
হোগলার ছই নতুন বাঁধিয়া গাব-জলে মাজা নায়,
বাপ চলিয়াছে মেয়েরে আনিতে সুদূরের ভিন গাঁয়।
বৈঠার ঘায়ে গলাজলে-ডোবা নাচিছে আমন ধান,
কলমির লতা জড়াইয়া তারে ফুলহাসি করে দান!

ঢ্যাপের মোয়ায় চিত্রিত হাঁড়ি আবার ভরিয়া যায়,
পিঠায় আঁকিয়া নতুন নকশা রাত ভোর করে মায়।

জলের কন্যা চলেছে জলের পরে,
মাছেরা চলেছে দলে দলে আজ পথটি তাহার ধরে।
রুহিত লাফায়, চিতল লাফায়, ভাটা মাছ সারি সারি,
সাথে সাথে যায় আগে পিছে ধায় খুশি যেন ওরা তারি।
শোল মাছ তার শিশুপোনাগুলি ছড়ায়ে লেজের ঘায়,
টুবটুব করে আদরিয়া পুন জড়াইছে বুক-ছায়;
নকসী কাঁথাটি মেলিয়া ধরিয়া গুমরে চাষার নারী,
সযতনে যেন গুটায়ে ধরিয়ে বুকের নিকটে তারি।
জলঘাসগুলি ঈষৎ কাঁপিছে তাদের চলার দোলে,
মৃদুল বাতাসে ঝুমিতেছে বন জলের দুনিয়া কোলে।

জলের কন্যা যায়,
নতুন পানির লিখন বহিয়া বদ্ধ বিলের ছায়।
তটের বক্ষে আছাড়িয়া মাথা ক্ষতবিক্ষত করি,
বন্দী-মাছেরা কাটাইত দিন জীয়ন্তে যেন মরি।
অঙ্গ ভরিয়া শ্যাওলা-জড়ানো নির্জীব-ঘুম-দোলে,
রোগ-পাণ্ডুর অসাড় দেহ যে পড়িতে চাহিছে ঢলে।
আজিকে নতুন জল-কল্লোল শুনিতে পেয়েছে তারা,
সহসা অঙ্গে হিল্লোলি ওঠে উধাও গতির ধারা!
কে যেন ঘোষিছে তাহাদের কানে সহস্র দিক হতে,
ভাঙ ভাঙ কারা ভাঙ ভাঙ পাড় উদ্দাম জলস্রোতে।

জলের কন্যা জল-পথ দিয়ে যায়,
বকের ছানারা পাখার আড়াল রচিছে তাহার গায়।
দুইধারে ঘন কেয়ার কুঞ্জ ছড়ায় সুবাস-রেণু,
মাতাল বাতাস বহিয়া বহিয়া চুমিছে বনের বেণু।
তটে তটে কাঁদে শূন্য কলসি, কুটিরের দীপ ডাকে,
আঙিনার বেলি মাটিতে লুটায়, কে কুড়ায়ে লবে তাকে?

এ লেডি উইথ এ ল্যাম্প

গভীর রাতের কালে,
কুহেলি আঁধার মূর্ছিতপ্রায় জড়ায়ে ঘুমের জালে
হাসপাতালের নিবিয়াছে বাতি ; দমকা হাওয়ার ঘায়,
শত মুমূর্ষু রোগীর কাঁদন শিহরিছে বেদনায়।
কে তুমি চলেছ সাবধান পদে বয়স-বৃদ্ধা-নারী!
দুই পাশে তব রুগ্ণ-ক্লিন্ন শুয়ে আছে সারি সারি।
কাহার পাখাটি জোরে চলিতেছে, বালিশ সরেছে কার,
বৃষ্টির হাওয়া লেগে কার গায়ে শিয়রে খুলিয়া দ্বার!
ব্যাণ্ডেজ কার খুলিয়া গিয়াছে, কাহার চাই যে জল,
স্বপন দেখিয়া কেঁদে ওঠে কেবা, আঁখি দুটি ছল ছল।
এসব খবর লইতে লইতে চলিয়াছ একাকিনী,
দুঃখের কোন সান্ত্বনা তুমি, বেদনায় বিষাদিনী।

গভীর নিশীথে, অনেক ঊর্ধ্বে জ্বলিছে আকাশে তারা,
তোমার এ স্নেহ-মমতার কাজ দেখিতে পাবে না তারা ;
রাত-জাগা পাখি উড়িছে আকাশে, জানিবে না সন্ধান,
রাত-জাগা ফুল ব্যস্ত বড়োই বাতাসে মিশাতে ঘ্রাণ ;
তারা কেহ আজ জানিতে পাবে না, তাহাদেরি মতো কেহ,
সারা নিশি জাগি বিলাইছে তার মায়েলি বুকের স্নেহ।
এই বিভাবরী বড়োই ক্লান্ত, বড়োই স্তব্ধতম,
উতলা বাতাস জড়াইয়া কাঁদে আঁধিয়ার নির্মম।
মৃত্যু চলেছে এলায়িত কেশে ভয়াল বদন ঢাকি,
পরখ করিয়া কারে নিয়ে যাবে, কারে সে যাইবে রাখি।
মহামরণের প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝখানে,
মহীয়সী তুমি জননী মূরতি আসিলে কি সন্ধানে ;
জীবন-মৃত্যু মহা-রহস্য তুমি কি যাইবে খুলি,
ধরণীর কোন গোপন কুহেলি আজিকে লইবে তুলি।
যে বৃদ্ধ-কাল সাক্ষ্য হইয়া আছে মানুষের সাথে,
তুমি কি তাহার বৃদ্ধা সাথিনী আসিয়াছ আজ রাতে?

নিখিল নরের আদিম জননী আজিকে তোমার বেশে,
রুগ্‌ণ তাহার সন্তানদেরে দেখিয়া নিতেছ এসে।
নিরালা আমার শয্যার পাশে তোমার আঁচল-ছায়,
স্তব হয়ে আজ জড়ায়ে রহিতে বড়ো মোর সাধ যায়!

রজনী-গন্ধার বিদায়

শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদ নামিছে চক্রবালে,
রজনী-গন্ধা রূপসীর আঁখি জড়াইছে ঘুম-জালে।
অলস চরণে চলিতে চলিতে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে,
শিথিল শ্রান্তি চুমিছে তাহার সারাটি অঙ্গ ধরে!
উতল কেশেরে খেলা দিতে শেষ উতল রাতের বায়ু;
ঘুমাতে ঘুমাতে কাঁপিয়া উঠিছে স্মরিয়া রাতের আয়ু।
রজনী-গন্ধা রাতের রূপসী ঝিমিছে শ্রান্তিভরে,
অঙ্গ হইতে ঝরিছে কুসুম একটি একটি করে।

শিয়রে চাঁদের দীপটি ঝিমিয়া হইয়া আসিছে ম্লান,
রাত-বিহগীর কণ্ঠে এখন মৃদু হয়ে এল গান।
পূর্ব তোরণে আসিছে রূপসী রঙিন উষসী-বালা,
হস্তে লইয়া রাঙা দিবসের অফুট কুসুম-ডালা।
রজনী-গন্ধা ঘুমায় আলসে শিথিল দেহটি তার,
লুটাইয়া পড়ে বৃন্তশয়নে স্বপন-নদীর পার।

ভুবনভোলানো মরি মরি ঘুম—অপরূপ, অপরূপ!
বিধাতা বুঝিবা ধ্যান করিতেছে যুগ যুগ রহি চুপ!
এ-রূপ মহিমা সহিতে পারে না ভোরের রূপসী উষা;
রজনী-ফুলের অঙ্গ হইতে হরিয়া লইছে ভূষা!
শাড়িতে তাহার তারা ফুলগুলি দলিয়া পিষিছে পায়ে,
ভেঙেছে রাতের পাখির বাঁশরি উদাস বনের বায়ে!
শিয়রে চাঁদের মণিদীপ-খানি থাপড়ে নিবায়ে দিল,
অঙ্গ হইতে শিশির ফোঁটার গহনা কাড়িয়া নিল।

থামিল বনের ঝিল্লির কণ্ঠে ঘুমপাড়ানিয়া সুর,
জোনাকি পরীরা দীপগুলি লয়ে চলিল গহন-পুর।
মৃত আত্মারা কবরে লুকাল, মহা-রহস্য তার,
আঁচলে জড়ায়ে ধীরে ধীরে ধীরে রজনী রুধিল দ্বার।

চারিদিকে নব আলোকের জয়; চিরপরিচিত সব,
মহা-কোলাহলে আরম্ভ হলো দিনের মহোৎসব।
এখন শুধুই লোক জানাজানি মুখ চেনাচিনি আর,
দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া 'বানিয়া' খুলিল দ্বার।

কোথায় ঘুমাল রজনী-গন্ধা কিবা রহস্য-জাল,
সারারাতি তারে জড়াইয়াছিল? কে শোনে সে জঞ্জাল।
রাতের রজনী-গন্ধা ঘুমায়, চির বিস্মৃতি-পুরে—
তবু রয়ে রয়ে কি করুণ বাঁশি বেজে ওঠে বহুদূরে।

বাস্তুত্যাগী

দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীরে খোঁজ করি,
মন্দিরে আজ বাজেনাকো শাঁখ সন্ধ্যা-সকাল ভরি।
তুলসিতলা সে জঙ্গলে ভরা, সোনার প্রদীপ লয়ে,
রচে না প্রণাম গাঁয়ের রূপসী মঙ্গলকথা কয়ে।
হাজরাতলায় শেয়ালের বাসা, শেওড়া গাছের গোড়ে,
সিঁদুর মাখানো, সেই স্থান আজি বুনো শুয়োরের কোড়ে।
আঙিনার ফুল কুড়াইয়া কেউ যতনে গাঁথে না মালা,
ভোরের শিশিরে কাঁদিছে পূজার দূর্বাশীষের থালা।
দোল-মঞ্চ যে ফাটলে ফাটিছে, ঝুলনের দোলাখানি,
ইঁদুরে কেটেছে, নাটমঞ্চের উড়েছে চালের ছানি।

কাক-চোখ জল পদ্মদীঘিতে কবে কোন রাঙা মেয়ে,
আলতা-ছোপানো চরণদুখানি মেলেছিল ঘাটে যেয়ে।
সেই রাঙা রঙ ভোলে নাই দীঘি, হিজলের ফুল বুকে,
মাখাইয়া সেই রঙিন পায়েরে রাখিয়াছে জলে টুকে।

আজি ঢেউহীন অপলক চোখে করিতেছে তাহা ধ্যান,
ঘন-বন-তলে বিহগ কণ্ঠে জাগে তার স্তব গান।
এই দীঘি-জলে সাঁতার খেলিতে ফিরে এসো গাঁর মেয়ে,
কলমি-লতা যে ফুটাইবে ফুল তোমারে নিকটে পেয়ে।
ঘুঘুরা কাঁদিছে উহু উহু করি, ডাহুকেরা ডাক ছাড়ি,
গুমরায় বন সবুজ শাড়িরে দীঘল নিশাসে ঝাড়ি।
ফিরে এসো যারা গাঁও ছেড়ে গেছ, তরুলতিকার বাঁধে,
তোমাদের কত অতীত-দিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।
সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ,
নারকেল-তরু ঊর্ধ্বে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।
বুনো পাখিগুলি এডালে ওডালে, কইরে কইরে কাঁদে,
দীঘল রজনী খণ্ডিত হয় পোষা কুকুরের নাদে।

কার মায়া পেয়ে ছাড়িলে এদেশ, শস্যের থালা ভরি,
অন্নপূর্ণা আজো যে জাগিছে তোমাদের কথা স্মরি।
আঁকাবাঁকা বাকা শত নদীপথে ডিঙ্গি তরীর পাখি,
তোমাদের পিতা-পিতামহদের আদরিয়া বুকে রাখি ;
কত নামহীন অথই সাগরে যুঝিয়া ঝড়ের সনে,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি লুটিয়া এনেছে তোমাদের গেহ-কোণে।
আজি কি তোমরা শুনিতে পাও না সে নদীর কলগীতি,
দেখিতে পাও না ঢেউ-এর আখরে লিখিত মনের প্রীতি?

হিন্দু-মুসলমানের এ দেশ, এ দেশের গাঁ'র কবি,
কত কাহিনীর সোনার সূত্রে গেঁথেছে সে রাঙা ছবি।
এ দেশে কাহারো হবে না একার, যতখানি ভালোবাসা,
যতখানি ত্যাগ যে দেবে, হেথায় পাবে ততখানি বাসা।
বেহুলার শোকে কাঁদিয়াছি মোরা, গংকিনী নদীসোঁতে,
কত কাহিনীর ভেলায় ভাসিয়া গেছি দেশে দেশ হতে।
এমাম হোসেন, সকিনার শোকে ভেসেছে হলুদপাটা,
রাধিকার পার নূপুরে মুখর আমাদের পার-ঘাটা।
অতীতে হয়ত কিছু ব্যথা দেছি পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই, সেসব অতীত কথা।

এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, নূতন দৃষ্টি দিয়ে,
নূতন রাষ্ট্র গড়িব আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে।
ভাঙা ইস্কুল আবার গড়িব, ফিরে এসো মাস্টার;
হুংকারে ভাই তাড়াইয়া দিব কালি অজ্ঞানতার।
বনের ছায়ায় গাছের তলায় শীতল স্নেহের নীড়ে,
খুঁজিয়া পাইব হারাইয়া যাওয়া আদরের ভাইটিরে।

কমলা রানীর দীঘি

কমলা রানীর দীঘি ছিল এইখানে,
ছোটো ঢেউগুলি গলাগলি ধরি ছুটিত তটের পানে।
আধেক কলসি জলেতে ডুবায়ে পল্লী-বধূর দল,
কমলা রানীর কাহিনী স্মরিতে আঁখি হতো ছল ছল।
আজ সেই দীঘি শুকায়েছে, এর কর্দমাক্ত বুকে,
কঠিন পায়ের আঘাত হানিয়া গরুগুলি ঘাস টুকে।
জলহীন এই শুষ্ক দেশের তৃষিত জনের তরে।
কোন্ সে নৃপের পরান উঠিল করুণার জলে ভরে।
সে করুণা-ধারা মাটির পাত্রে ভরিয়া দেখার তরে,
সাগরদীঘির মহাকল্পনা জাগিল মনের ঘরে।

লক্ষ কোদালি হইল পাগল, কঠিন মাটিরে খুঁড়ি,
উঠিল না হায় কল-জল-ধারা গহন পাতাল ফুঁড়ি।
দাও, জল দাও, কাঁদে শিশু মার শুষ্ক কণ্ঠ ধরি,
ঘরে ঘরে কাঁদে শূন্য কলসি বাতাসে বক্ষ ভরি।
লক্ষ কোদালি আরো জোরে চলে, কঠিন মাটির থেকে,
শুষ্ক বালুর ধূলি উড়ে যায় উপহাস যেন হেঁকে।
'কোথায় রয়েছে ভাট ব্রাহ্মণ, কোথায় গণক দল,
জলদি করিয়া গুনে দেখো কেন দীঘিতে ওঠে না জল?
আকাশ হইতে গুনিয়া দেখিও শত-তারা আঁখি দিয়া,
পাতালে গুনিও বাসুকি-ফণার মণি-দীপ জ্বালাইয়া।
ঈশানে গুনিও ঈশানী-গলের নর-মুণ্ডের সনে,
দক্ষিণে গুনো, শাহ্ মান্দার যেথা সুন্দর বনে।'

আকাশ গনিল, পাতাল গনিল, গনিল দশটি দিক,
দীঘিতে কেন যে জল ওঠে নাকো বলিতে নারিল ঠিক।

নিশির শয়নে জোড়মন্দিরে স্বপন দেখিছে রানী,
কে যেন আসিয়া শুনাইল তারে বড়ো নিদারুণ বাণী :
'সাগরদীঘিতে তুমি যদি রানী! দিতে পার প্রাণদান,
পাতাল হইতে শতধারা-মেলি জাগিবে জলের বান।'
স্বপন দেখিয়া জাগিল যে রানী, পুবের গগন-গায়,
রক্ত লেপিয়া দাঁড়াইল রবি সুদূরের কিনারায়।
'শোনো শোনো ওহে পরানের পতি ছাড় গো আমার মায়া,
উড়ে চলে যায় আকাশের পাখি পড়ে রয় শুধু ছায়া।'

পেটিরা খুলিয়া তুলে নিল রানী অষ্ট অলংকার,
রাসমণ্ডল শাড়ির লহরে দেহটি জড়াল তার।
কৌটা খুলিয়া সিঁদুর তুলিয়া পরিল কপাল ভরি,
দুর্গা প্রতিমা সাজিল বুঝি বা দশমীর বাঁশি স্মরি।
ধীরে ধীরে রানী দাঁড়াইল আসি সাগরদীঘির মাঝে,
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী শুকনো তটের কাছে।
পাতাল হইতে শতধারা মেলি নাচিয়া আসিল জল,
রানীর দুখানা চরণে পড়িয়া হেসে ওঠে খল খল।
খাড়ু জলে রানী খুলিয়া ফেলিল পায়ের নূপুর তার,
কোমরজলেতে ছিঁড়িল যে রানী কোমরে চন্দ্রহার।
বুক জলে রানী কণ্ঠ হইতে গজমতি হার খুলে,
কোলের ছেলেটি জয়ধর কোথা দেখে রানী আঁখি তুলে।
গলাজলে রানী খোঁপা হতে তার ভাসাল চাঁপার ফুল,
চারিধার হতে কল-জলধারা ভরিল দীঘির কূল।
সেই ধারা সনে মিশে গেল রানী আর আসিল না ফিরে,
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী আকাশ বাতাস ঘিরে।
কমলা রানীর এই সেই দীঘি, কার অভিশাপে আজ,
খুলিয়া ফেলেছে অঙ্গ হইতে জল-কুমুদীর সাজ।
পাড়ে পাড়ে আজ আছাড়ি পড়ে না চঞ্চল ঢেউদল,
পল্লী-বধূর কলসির ঘায়ে দোলে না ইহার জল।

কমলা রানীর কাহিনী এখন নাহিক কাহারো মনে,
রাখালের বাঁশি হয় না করুণ নিশীথউদাস বনে।
শুধু এই গাঁর নূতন বধূরে বরিয়া আনিতে ঘরে,
পল্লীবাসীরা বরণকুলাটি রেখে যায় এর পরে।
গভীর রাত্রে সেই কুলাখানি মাথায় করিয়া নাকি,
আলেয়ার মতো কে এক রূপসী হেসে ওঠে থাকি থাকি।

সকিনা

দুখের সায়রে সাঁতারিয়া আজ সকিনার তরীখানি,
ভিড়েছে যেখানে, সেথা নাই কূল, শুধুই অগাধ পানি।
গরীবের ঘরে জনম তাহার, বয়স বাড়িতে হায়,
কিছু বাড়িল না, একরাশ রূপ জড়াইল শুধু গায়।
সেই রূপই তার শত্রু হইল, পণ্যের মতো তারে,
বিয়ে দিল বাপ দুই মুঠি ভরি টাকা আধুলির ভারে।

খসম তাহার নাগী-কাটা-চোর, রাতে রহিত না ঘরে,
হেথায় হোথায় ঘুরিয়া ফিরিত সিঁদকাঠি হাতে করে।
সারাটি দিবস পড়িয়া ঘুমাত, সকিনার সনে তার,
দেখা যে হইত ক্ষণেকের তরে, মাসে দুই একবার।
সেও কোনো তার কল্পিত এক অপরাধ ভেবে মনে,
মারিবার যবে হতো প্রয়োজন অতীব ক্রোধের সনে।
এমন স্বামীর বন্ধন ছাড়ি বহু হাত ঘুরি ফিরি,
দুঃখের জাল মেলে সে চলিল জীবনের নদী ঘিরি।
সেসব কাহিনী বড়ো নিদারুণ, মোড়লের দরবার,
উকিলের বাড়ি, থানার হাজত, রাজার কাছারি আর ;
ঘন পাটক্ষেত, দূর বেতঝাড়, গহন বনের ছায়,
সাপের খোড়লে, বাঘের গুহায় কাটাতে হয়েছে তায় ;
দিনেরে লুকায়ে, রাতেরে লুকায়ে সেসব কাহিনী তার,
লিখে সে এসেছে, কেউ কোনো দিন জানিবে না সমাচার।

সে কেচ্ছা কোনো কবি গাহিবে না কোনো দেশে কোনো কালে,
সকিনারি শুধু সারাটি জনম দহিবে যে জঞ্জালে।
এত যে আঘাত, এত অপমান, এত লাঞ্ছনা তার,
সবই তার মনে, এতটুকু দাগ লাগে নাই দেহে তার।
দেহ যে তাহার পদ্মের পাতা, ঘটনার জল-দল,
গড়ায়ে পড়িতে রূপেরে করেছে আরো সে সমুজ্জ্বল।

সে রূপ যাদের টানিয়া আনিল তারা দুই হাত দিয়ে,
জগতের যত জঞ্জাল আনি জড়াইল তারে নিয়ে।
কেউ দিল তারে বিষের ভাণ্ড, কেউ বা প্রবঞ্চনা,
কেউ দিল ঘৃণা, কলঙ্ক কালি এনে দিল কোন জনা।
সে রূপের মোহে পতঙ্গ হয়ে যাহারা ভিড়িল হায়,
তারা পুড়িল না অমর করিয়া বিষে বিষাইল তায়।
তাদেরি সঙ্গে আসিল যুবক, তরুণ সে জমিদার,
হাসিখুশি মুখ, সৌম্য মুরতি দেশ-জোড়া খ্যাতি তার।
সে আসি বলিল, ‘সব গ্লানি হতে তোমারে মুক্ত করি,
মোর গৃহে নিয়ে রানীর বেশেতে সাজাইব এই পরী।’
করিলও তাই, যে জাল পাতিয়া রূপ-পিয়াসীর দল,
রেখেছিল তারে বন্দী করিয়া রচিয়া নানান ছল ;
সেসব হইতে টানিয়া তাহারে নিয়ে এল করি বার,
গত জীবনের মুছিয়া ঘটনা জীবন হইতে তার!
মেঘ-মুক্ত সে আকাশের মতো দাঁড়াল যখন এসে,
রূপ যেন তারে করিতেছে স্তব সারাটি অঙ্গে ভেসে।

সুখের বাসর

নয়ী জমিদার আদিলদ্দীন ধরি সকিনার হাত,
কহিল, ‘চলো গো সোনার বরনী, মোর ঘরে মোর সাথ!
মালার মতন করিয়া তোমারে পরিয়া রাখিব গলে,
পঙ্খী করিয়া পুষিব তোমারে আমার বুকের তলে।

গানের সুরের কথায় তোমারে উড়াব আকাশ ভরি,
আমার দুনিয়া রঙিন করিব তোমারে মেহেদি করি!'
সকিনা কহিল, 'আপনি মহান, হতভাগিনীর তরে,
যাহা করেছেন জিন্দেগি যাবে ঋণ পরিশোধ করে।
তবুও আমারে ক্ষমা করিবেন, আপনার ঘরে গেলে,
বসিতে হইবে হতভাগিনীরে কলঙ্ককালি মেলে
আসমান সম আপনার কূল, মোর জীবনের মেঘে,
যত চান আর সুরুয তারকা সকল ফেলিবে ঢেকে।
ধোপ কাপড়েতে দাগ লাগিলে যে সে দাগ মোছে না আর,
অভাগীর তরী ভাসাইতে দিন ভুলের গাঙের পার।'

আদিল কহিল, 'সুন্দর মেয়ে! থাক চাঁদ মেঘে ঢেকে,
তুমি যে উদয় হও মোর মনে জোছনা ঝলক এঁকে।
মোর ভালোবাসা চান্দের সম, তব কলঙ্ক তার,
শোভা হয়ে শুধু ছড়ায়ে পড়িবে নানা কাহিনীতে আর।'
সকিনা কহিল, 'পায়ে পড়ি তুমি আমারে বুঝো না ভুল,
কত না বিপদ সায়র হইতে তুমি মোরে দেছ কূল।
তোমার নিকটে জমা রাখিলাম ইহ-পরকাল মোর,
দণ্ডের তরে তোমারে ভুলিলে আমি যেন লই গোর:
তোমার লাগিয়া আমি যে বন্ধু তাপসিনী হয়ে রব,
গহন বনেতে কুঁড়ে ঘরে বসি তব নাম শুধু লব।
ক্ষমা করো মোরে, তোমার জীবনে দোসর হইব বলে,
সাধ থাকিলেও সাধ্য নাহিক আমারি ভাগ্যফলে।'

আদিল কহিল, 'সুন্দর মেয়ে! তুমি কেন ভয় পাও?
আমার আকাশে তুমি হবে মোর উদয়-তারার নাও।
এই বুক মোর এত প্রসারিত, তাহার আড়াল দিয়া,
দুনিয়া ছড়ান তব কলঙ্ক রাখিব যে আবরিয়া:
এ বাহুতে আছে এত বিক্রম, তার মহা-মহিমায়,
এতটুকু গ্লানি আনিতে পারে না কেউ ও জীবনটায়।'

'তবু মোরে ক্ষমা করিও বন্ধু!' সকিনা কহিল কাঁদি,
'যারে ভালোবাসি তারে কোন প্রাণে দেব এই দেহ সাধি।'

একটি বিপদ হতে উদ্ধার পাইবার লাগি তার,
আরটি বিপদে পড়িতে হয়েছে বদলে এ দেহটার।
পণ্যের মতো দেহটারে সে যে বিলায়েছে জনে জনে,
কোন লালসার লাগি নহে শুধু বাঁচিবার প্রয়োজনে।
এই মন লয়ে কতজন সনে করিয়াছে অভিনয়,
কত মিথ্যার নকশা রচিয়া ফিরেছে ভুবনময়।
সে শুধু ক্ষুধার আহারের লাগি কে তাহা বুঝিতে পাবে?
সবাই তাহারে চিন্তা করিবে নানা কুৎসিতভাবে।
সেই মন আর সেই দেহ যাহা সবখানে কদাকার,
কেমন করিয়া দিবে তারে যেবা সব চেয়ে আপনার।
'পায়ে পড়ি তব, শোন গো বন্ধু! ছাড় অভাগীর আশা,
আমারে লইয়া ভাঙিও না তব আসমান সম বাসা।'

আদিল কহিল, 'বুঝিলাম মেয়ে! রজনী হইলে শেষ,
রাতের বাসারে উপহাসি' পাখি চলে যায় আর দেশ;
সকল বিপদ হইতে তোমারে করিয়াছি উদ্ধার,
আমারে লইয়া তোমার জীবনে প্রয়োজন কিবা আর?'
'কি কথা শুনালে পরানবন্ধু!' সকিনা কাঁদিয়া কয়,
'তীক্ষ্ণ বরশা-শেল যে বিঁধালে আমার জীবনটায়।
এত যদি মনে ছিল গো বন্ধু, এই অভাগিনী তরে,
তোমার পরান অমন করিয়া এমনই যদি বা করে;
আমারে লইয়া এতই তোমার হয় যদি প্রয়োজন,
আজি হতে তবে সঁপিলাম পায়ে এই দেহ আর মন।
সাক্ষী থাকিও আল্লা রসুল! আপন অনিচ্ছায়,
সবচেয়ে যেবা পবিত্র মম তারে দিনু আমি হায়;
এই দেহ মন যাহা জনে জনে কালি যে মাখায়ে গেছে,
তাই নিল আজি মোর ফেরেস্তা আপনার হাতে যেচে।
বনে থাকো তুমি পউখ পাখালি আমারে করিও দোয়া,
আজ হতে আমি বন্দী হইনু লইয়া ইহার মায়া।
অনেক উর্ধ্বে থাকো গো তোমরা চন্দ্র-সূরুয দুটি,
মোদের জীবন রহে যেন সদা তোমাদের মতো ফুটি।
দোয়া করো তুমি সোনার পতি গো, দোয়া করো তুমি মেয়ে,
তোমার জীবনে জড়ালাম আমি লতার মতন করে।

এ সূতা বাঁধন জনমের মতো কখনো যেন না টুটে,
যত ভালোবাসা ফুলের মতন রহে যেন এতে ফুটে।'

সকিনারে লয়ে আদিল এবার পাতিল সুখের ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।
সোঁতের শেহলা ভাসিতে ভাসিতে এবার পাইল কূল,
আদিল বলিল, 'গাঙের পানিতে কুড়ায়ে পেয়েছি ফুল।
এই ফুল আমি মালায় গাঁথিয়া গলায় পরিয়া নেব,
এই ফুল আমি আতর করিয়া বাতাসে ছড়ায়ে দেব।
এই ফুলে আমি লিখন লিখিব, ভালোবাসা দুটি কথা,
এই ফুলে আমি হাসিখুশি করে জড়াব জীবন-লতা।'

করিলও তাই, সকিনারে দিয়ে রঙের রঙের শাড়ি,
আদিল কহিল, 'সবগুলি মেঘ এসেছে সন্ধ্যা ছাড়ি।
সবগুলি পাখি রঙিন পাখায় করেছে হেথায় মেলা,
সবগুলি রামধনু এসে দেহে জুড়েছে রঙের খেলা।'
ঝলমল মল গয়নায় গাও ঝলমল মল করে,
ঝিকিমিকি ঝিকি জোনাক মতিরা হাসিছে অঙ্গ ধরে।

কৈশোর যৌবন দুহু মেলি গেল

এখনো গন্ধ বদ্ধ কোরকে, দুএকটি রাঙা দল,
উঁকি ঝুঁকি দিয়ে পান করিতেছে ভোরের শিশির জল।
রঙিন অধরে সরল হাসিটি, বিহান বেলার আগে,
মেঘগুলি যেন রঙে ডুগুডুগু ঊষসীর অনুরাগে।
এ হাসি এখনি কৌতুক হয়ে নাচিবে নানান ঢঙে,
মেঘের আড়ালে কভু লুকোচুরি খেলিবে কতনা রঙে।

আঁখি দুটি আজো স্বচ্ছ-সরল কাজল দীঘির মতো,
কারো কলসির আঘাতে এখনো হয় নাই ঢেউ-ক্ষত।
সব কিছু এর মুকুরে এখনো উজ্জ্বল হয়ে ভাসে,
যে আসে নিকটে তাহারেই সে যে আদরিয়া ভালোবাসে।

আরো কিছুদিন পরে এই আঁখি বিদ্যুদ্দাম হয়ে,
নৃত্যচপল খেলিয়া বেড়াবে মেঘ হতে মেঘে বয়ে!
ওই ভুরু-ধনু আরো বাঁকাইয়া চাহনির তীরগুলি,
কত হতভাগা মৃগেরে বধিবে কাজলের বিষগুলি।

ওই বাহুদুটি যুগল মমতা, যে হয় নিকটতর,
তাহারি গলায় পরাইয়া দেয় জানে না আপন পর।
কিছুদিন পরে ও বাহু লতায় ফুটিবে মোহের ফুল,
আকর্ষণের মন্ত্র পড়িয়া ছড়াবে রঙের ভুল।
তাহারি বাঁধনে বন্দী হইতে চির জনমের তরে,
আসিবে কুমার রূপ-গানে তার অধর বাঁশরি ভরে।

বক্ষের পরে আধ-মুকুলিত যুগল কমল দুটি,
এখনো সুবাসে ভরে নাই দিক পল্লব দলে ফুটি।
কিছুদিন পরে ওই মন্দিরে অনঙ্গ নিজে পশি,
ভালোবাসিবার মন্ত্র রচিবে ধ্যানের আসনে বসি।
মন্ত্র-সিদ্ধ একদিন তার ফুলধনু করি থির,
ফিরাবে ঘুরাবে স্বেচ্ছায় সেথা স্থাপি এ যুগল তীর।

এখনো অফুট কুসুমিত দেহ, জবাকুসুমের দ্যুতি,
আনত উষার নব মেঘদলে রাঙিছে রূপের স্তুতি।
নীহারে ভূষিত কুসুম-কমল আধেক মুদিত আঁখি,
সরসী নাচিছে হরষিত দোলে আরশিতে তারে রাখি।
বিহান বেলার আধ ঘুমে পাওয়া আধ স্বপনের স্মৃতি,
দূরাগত কোনো সুখদ বাঁশির আবছা মধুর গীতি।
সে যেন উষার হসিত কপোলে শ্বেতচন্দন-কোঁটা,
যে যেন পূজার নিবেদিত ফুল দেবতাচরণে লোটা।

আরো ক্ষণকাল দাঁড়াও গো মেয়ে! তোমার সোনার হাসি,
আরো ক্ষণকাল দেখে চলে যাই আমি কবি পরবাসী।
আরো ক্ষণকাল করো গো বেলম, ভোরের শিশিরকণা,
তাই দিয়ে যদি হয় কভু কোনো অমরতা-গীতি বোনা।

আমি ক্ষণিকের অতিথি তোমার, তব অনাগত দিনে,
জানি জানি এই পথিক-সখারে লইতে পাবে না চিনে।
ওই দেহ-বীণা বাজিবে সেদিন, হাত চোখ মুখ কান,
শত তার হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়াবে কুহক গান।
তারি ঝংকারে রণিবে ধরণী, ফুলের স্তবক হয়ে,
আসিবে পূজারী স্তব-গান গেয়ে ও দেহের দেবালয়ে।
তাহাদের তরে রাখিয়া গেলাম আমার আশীর্বাদ,
যেন তারা পায় তোমার মাঝারে মোর অপূরিত সাধ।

হলুদ বাঁটিছে মেয়ে

হলুদ বাঁটিছে হলুদবরনী মেয়ে,
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে।
দুই হাতে ধরি কঠিন পুতারে ঘষিছে পাটার পরে,
কাঁচের চুড়ি যে রিনিক ঝিনিকি নাচিছে খুশির ভরে।
দুইটি জঙ্ঘা দুইধারে মেলা কাঠ-গড়া কামনার,
তাহার উপর উঠিতে নামিতে সোনার দেহটি তার ;
মর্দিত দুটি যুগল সারসী শাড়িসরসীর নীরে,
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্প-ধনুরে মারিতেছে ঘুরে ফিরে।

হলুদ বাঁটিছে হলুদবরনী মেয়ে,
রঙিন উষার আবছা হাসিতে আকাশ ফেলিল ছেয়ে।
মিহি-সুরী গান গুন গুন করে ঘুরিয়ে হাসিল ঠোঁটে,
খুশির ভোমরা উড়িয়া শ্রীমুখ-পদ্মের দল লোটে।
বিগত রাতের রভস-সুখের মদিরা জড়িত স্মৃতি,
সারাটি পাটারে হলুদে জড়ায়ে গড়ায়ে রঙিছে ক্ষিতি।
গাছের ডালে যে বুলবুলি বসি ভরিয়া দুখানা পাখ,
লিখিয়া হইতে তারি এতটুকু মেলিছে সুরেলা ডাক।

হলুদ বাঁটিছে হলুদবরনী মেয়ে,
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে।

ডোল-ভরা ধান, কোল-ভরা শিশু, বুক-ভরা মিঠে গান,
কোকিল-ডাকানো আম্রছায়ায় পাতার কুটিরখান ;
চাঁদিনী রাতের জোছনা আসিয়া গড়ায় বেড়ার ফাঁকে
কৃষাণ কণ্ঠে বাঁশিটি বাজিয়া আকাশেতে প্রীতি আঁকে।
অর্ধেক রাত নকসী-কাঁথাটি মেলন করিয়া ধরি,
অতি সযতনে আঁকে ফুল-লতা মনের মমতা ভরি।
সুখ যেন আসি গড়াইয়া পড়ে, সূতার লতালি কাঁদে,
মাটির ধরায় টেনে নিয়ে আসে গগনবিহারী চাঁদে।

অনুরোধ

ছিপছিপে তার পাতলা গঠন, রাঙা যে টুকটুক
সোনা রূপায় ঝলমল দেখলে তাহার মুখ।
সেই মেয়েটি বলল মোরে দিয়ে একখান খাতা,
'লিখো কবি ইহার মাঝে যখন খুশি যা তা।'

উত্তরে তায় কইনু আমি, 'এই যে রূপের তরী,
বেয়ে তুমি চলছ পথে আহা মরি মরি।
যে পথ দিয়ে যাও যে পথে পথিকজনার বুকে,
ঢেউ ভাঙিয়া এধার ওধার হয় যে কতই সুখে।
রূপের ডালি চলছ বয়ে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে,
কুসুম ফুলের মাঠখানি যে কতই রঙে রাঙে।

একটুখানি দাঁড়াও মেয়ে, অমন মুখের হাসি,
খানিকটা তার ধরে রাখি দিয়ে কথার ফাঁসি।
চলছ পথে ছড়িয়ে কতই রঙের রঙের ফুল,
কিছুটা তার লই যে এঁকে দিয়ে ভাষার ভুল।
রূপশালী ওই অঙ্গখানি, গয়না শাড়ির ভাঁজে,
আয়নাখানা সামনে নিয়ে দেখছ কত সাজে
সত্যি করে বলো কনো! (এ রূপ দেখে) সবার যেমন লাগে,
তোমার কাছে লাগে কি তার হাজার ভাগের ভাগে?

নিজের ভোগেই আসে না যা, কেনবা যতন ভরে,
সাবধানেতে রাখছ তাহায় সবার আড়াল করে!
রূপ দেখে যার ভালো লাগে, রূপ যে শুধু তার,
তার হৃদয়ে উথলপাথল রূপের মহিমার।
কেন তুমি কৃপণ এত! তোমার যাহা নয়,
পরের ধনে পোদ্দারি কি তোমার শোভা পায়?
সবই ত যায়, কিছুই ভবে রয় না চিরতরে,
বাসর রাতের শেষ না হতে রূপের প্রদীপ ঝরে।
কি করে বা রাখবে তারে? বাহুর বাঁধনখানি,
এতই শিথিল, পারে না যে রাখতে তারে টানি।

শুধু কথার সরিৎ-সাগর, তাহার নিতল জলে,
রূপের কমল রয় যে ফুটে মেলি হাজার দলে।
কথার খাঁচায় বন্দী হতে এই ভঙ্গুর ধরা,
কত কাল যে করছে সাধন হয়ে স্বয়ম্বরা।
সেই কথাও চিরকালের হয় না চিরদিন,
সেদিন তোমার আর আমারো রইবেনাক চিন।

কবিতা

তাহারে কহিনু, 'সুন্দর মেয়ে! তোমারে কবিতা করি,
যদি কিছু লিখি ভুরু বাঁকাইয়া রবে না ত দোষ ধরি!'
সে কহিল মোরে, 'কবিতা লিখিয়া তোমার হইবে নাম,
দেশে দেশে তব হবে সুখ্যাতি, আমি কিবা পাইলাম?'
স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিনু কি দিব জবাব আর,
সুখ্যাতি তরে যে লেখে কবিতা, কবিতা হয় না তার।
হৃদয়ের ফুল আপনি যে ফোটে কথার কলিকা ভরি,
ইচ্ছা করিলে পারিনে ফোটাতে অনেক চেষ্টা করি।
অনেক ব্যথার অনেক সহার, অতল গভীর হতে,
কবিতার ফুল ভাসিয়া যে ওঠে হৃদয় সাগর স্রোতে!

তারে কহিলাম, তোমার মাঝারে এমন কিছু যা আছে,
যাহার ঝলকে আমার হিয়ায় অনাহত সুর বাজে;
তুমিই হয়তো পশিয়া আমার গোপন গহন বনে,
হৃদয়-বীণায় বাজাইছ সুর কথার কুসুম সনে।
আমি করি শুধু লেখকের কাজ, যে দেয় হৃদয়ে নাড়া,
কবিতা ত তার; আর যেবা শোনে—কারো নয় এরা ছাড়া।
মানব জীবনে সবচেয়ে যত সুন্দরতম কথা,
কবিকার তারই গড়ন গড়িয়া বিলাইছে যথাতথা।
সেকথা শুনিয়া লাভ লোকসান কি জানি হয় না হয়,
কেহ কেহ করে সমরকন্দ তারি তরে বিনিময়।

হেলেনা

নতুন নাতিনী, সুচারুহাসিনী, মধুরভাষিণী ললনা,
হলুদে চুনেতে মিশাতে কিছুতে হয় না তাহার তুলনা।
তাহার নাসাতে কি যেন ভাষাতে ভোমর গাহিছে গাহনা,
যুগল আঁখির কাজলদীঘির নীরে বিজলির নাহনা।

জোড়া সে ভুরুতে যুগল ধনুতে চাহনি-তীর যে যোজিত,
যাহার উপরে হানিবে সেইরে হইবে জীবনে বধিত।
যুগল মালিকা গেঁথেছে কালিমা যেন বা দুইটি বাহুতে,
হেরি অধরিমা মুখ-চন্দ্রিমা হয়তো গ্রাসিবে রাহুতে!

চলনে বলনে ছলনে খেলনে ঝলকে পলকে কবিতা,
পাহাড় গলিত যাহার নাচিত নদিবা শুনিত কিছু তা,
যদি সে আকাশে দাঁড়াত সহাসে চাঁদ এসে দশ নখেতে,
দশ গ্রহে তারা আলোকের ধারা ছড়াত মনের সুখেতে।

উড়ুয়া জাহাজে চড়ি না তাই যে পটের পয়সা ভাঙিয়া,
তাহারে দেখিতে যাই যে চকিতে সুদূর আকাশে উড়িয়া।
সে যাহার গলে ও বাহুযুগলে পরাবে প্রণয়মালিকা,
কি তার সাতরে ঘুরিবে বাজারে লইয়া দ্রব্যতালিকা।

হংসগামিনী চলে যে মেদিনী তাহার পায়ের আঘাতে,
যে দেখে তাঁহারে মরে সে আহার তাহার রূপের প্রভাতে।
নামেতে হেলেনা কথা যে মেলে না বাখানিতে তার গীতি হে,
কবি হীনমতি মানি অখ্যাতি এখানে লিখিনু ইতি যে।

বঙ্গ-বন্ধু

(১৯৭১ সনের ১৬ই মার্চে লিখিত)

মুজিবর রহমান!
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে,
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।
বিগত দিনের যত অন্যায় অবিচার ভরা-মার,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয়ে বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনিদাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি।

মুজিবর রহমান!
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পূত-স্নান!
পীড়িত-জনের নিশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল,
জঠরে জঠরে অনাহার-জ্বালা করে তারে চঞ্চল।
শত ক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে,
মুহুর্মুহু যে ধ্বনিত হইছে তোমার পথের 'পরে।
মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলো।
জীবনদানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী পাছে,
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।

রাজভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছ জয়,
ফাঁসির মঞ্চে—মহত্ত্ব তব কখনো হয়নি ক্ষয়।
বাঙলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালির হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ।
তোমার একটি আঙুল হেলনে অচল যে সরকার
অফিসে অফিসে তালা লেগে গেছে—স্তব্ধ হুকুমদার।

এই বাংলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক।
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী—জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান।
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাংলার।
সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামানগোলার বুলেটের জোরে হানে বিষাক্ত শ্বাস।
তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া শাসন ত্রাসন ভয়,
আমরা বাঙালি মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয়।

ধন্য এ কবি ধন্য এ যুগে রয়েছে জীবন লয়ে,
সম্মুখে তার মহাগৌরবে ইতিহাস চলে বয়ে।
ভুলিব না সেই মহিমার দিন, ভাষার আন্দোলনে ;
বুলেটের ভয় তুচ্ছ করিয়া ছেলেরা দাঁড়াল রণে।
বরকত আর জব্বার আর সালাম পথের মাঝে,
পড়ে বলে গেল, 'আমরা চলিনু ভাইরা আসিও পাছে।'
উত্তর তার দিয়েছে বাঙালি, জানুয়ারি সত্তরে,
ঘরের বাহির হইল ছেলেরা বুলেটের মহা-ঝড়ে।
পথে পথে তারা লিখিল লেখন বুকের রক্ত দিয়ে,
লক্ষ লক্ষ ছুটিল বাঙালি সেই বাণী ফুকারিয়ে।
মরিবার সে কি উন্মাদনা যে, ভয় পালাইল ভয়ে,
পাগলের মতো ছোটে নর-নারী মৃত্যুরে হাতে লয়ে।
আরো একদিন ধন্য হইনু সে মহাদৃশ্য হেরি,
দিকে দিগন্তে বাজিল যেদিন বাঙালির জয়ভেরী।

মহাহুংকারে কংস-কারার ভাঙিয়া পাষাণদ্বার,
বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবেরে করিয়া আনিল বার।
আরো একদিন ধন্য হইব, ধন-ধান্যেতে ভরা,
জ্ঞানে-গরিমায় হাসিবে এদেশ সীমিত-বসুন্ধরা!
মাঠের পাত্রে ফসলেরা আসি ঋতুর বসনে শোভি,
বরনে সুবাসে আঁকিয়া যাইবে নকসী-কাঁথার ছবি।
মানুষে মানুষে রহিবে না ভেদ, সকলে সকলকার,
এক সাথ ভাগ করিয়া খাইবে সম্পদ যত মার!
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর রূপালীর তার পরে,
পরানভুলানো ভাটিয়ালি সুর বাজিবে বিশ্বভরে!
আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতল কুটিরগুলির তলে,
সুখ যে আসিয়া গড়াগড়ি করি খেলাইবে কুতূহলে।
আরো একদিন ধন্য হইব চির-নির্ভীকভাবে,
আমাদের জাতি নেতার পাগড়ি ধরিয়া জবাব চাবে,
'কোন অধিকারে জাতির স্বার্থ করিয়াছ বিক্রয়?'
আমার এদেশ হয় যেন সদা সেইরূপ নির্ভয়।

ধামরাই রথ

ধামরাই রথ, কোন অতীতের বৃদ্ধ সূত্রধর,
কতকাল ধরে গড়েছিল এরে করি অতি মনোহর।
সূক্ষ্ম হাতের বাটালি ধরিয়া কঠিন কাঠেরে কাটি,
কত পরী আর লতাপাতা ফুল গড়েছিল পরিপাটি।
রথের সামনে যুগল অশ্ব, সেই কত কাল হতে,
ছুটিয়া চলেছে আজিও তাহারা আসে নাই কোনোমতে।

তারপর এল নিপুণ পটুয়া, সূক্ষ্ম তুলির ঘায়,
স্বর্গ হইতে কত দেবদেবী আনিয়া রথের গায়;
রঙের রেখার মায়ায় বাঁধিয়া চির জনমের তরে,
মহা সান্ত্বনা গড়িয়া রেখেছে ভঙ্গুর ধরা পরে।

কৃষ্ণ চলেছে মথুরার পথে, গোপীরা রথের তলে,
পড়িয়া কহিছে, যেও না বন্ধু মোদের ছাড়িয়া চলে।
অভাগিনী রাধা, আহা তার ব্যথা যুগ যুগ পার হয়ে,
অঝোরে ঝরিছে গ্রাম্য পোটোর কয়েকটি রেখা লয়ে।

সীতারে হরিয়া নেছে দশানন, নারীর নির্যাতন
সার' দেশ ভরি হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালায়েছে হুতাশন;
রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর নর বানরের দল,
দশমুণ্ড সে রাবণে বধিয়া বহালো লহুর ঢল।

বস্ত্রহরণে দ্রৌপদী কাঁদে, এ অপমানের দাদ,
লইবারে সাজে দেশে দেশে বীর করিয়া ভীষণ নাদ।
কত বীর দিল আত্ম-আহুতি, ভগ্ন শঙ্খ শাখা,
বোঝায় বোঝায় পড়িয়া কত যে নারীর বিলাপ মাখা।
শ্মশানঘাটা যে রহিয়া রহিয়া মায়েদের ক্রন্দনে,
শিখায় শিখায় জ্বলিছে নিবিছে নব নব ইন্ধনে।

একদল মরে, আর দল পড়ে ঝাঁপায়ে শত্রুমাঝে,
আকাশ ধরণী সাজিল সে-দিন রক্তাম্বর সাজে।
তারপর সেই দুর্যোধনেরে সবংশে নিধনিয়া,
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত যে হলো সারা দেশ নিয়া।
এই ছবিগুলি রথের কাঠের নীলায়িত রেখা হতে,
কালে কালে তাহা রূপান্বিত হতো জীবনদানের ব্রতে।
নারীরা জানিত, এমনি ছেলেরা সাজিবে যুদ্ধ সাজে,
নারীর-নির্যাতন-কারীদের মহানিধনের কাজে

বছরে দু-বার বসিত হেথায় রথ-যাত্রার মেলা,
কত যে দোকান পসারী আসিত কত সার্কাস খেলা;
কোথাও গাজীর গানের আসরে খোলের মধুর সুরে,
কত যে বাদশা বাদশাজাদীরা হেথায় যাইত ঘুরে।
শ্রোতাদের মনে জাগায়ে তুলিত কত মহিমার কথা,
কত আদর্শ নীতির ন্যায়ের গাঁথিয়া সুরের লতা

পুতুলের মতো ছেলেরা মেয়েরা পুতুল লইয়া হাতে,
খুশির কুসুম ছড়ায়ে চলিত বাপ ভাইদের সাথে!
কোন যাদুকর গড়েছিল রথ তুচ্ছ কি কাঠ নিয়া,
কি মায়া তাহাতে মেখে দিয়েছিল নিজ হৃদি নিঙাড়িয়া।
তাহারি মায়ায় বছর বছর কোটি কোটি লোক আসি,
রথের সামনে দোলায়ে যাইত প্রীতির প্রদীপ হাসি।

পাকিস্তানের রক্ষাকারীরা পরিয়া নীতির বেশ,
এই রথখানি আগুনে পোড়ায়ে করিল ভস্মশেষ।
শিল্পীহাতের মহা সান্ত্বনা যুগের যুগের তরে,
একটি নিমেষে শেষ করে গেল এসে কোন বর্বরে!

More Books @ BDeBooks.Com

BDeBooks.com

Read Online
pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com